জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা

জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা

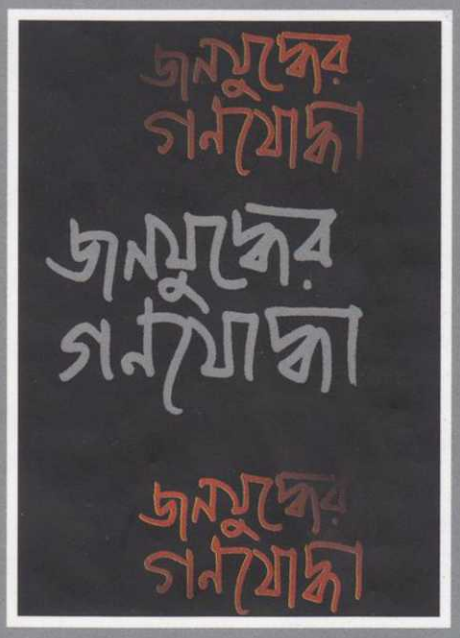

১৯৭১ সাল। রক্তসংগ্রামের এক অসহায় দিন। বাঙালি লড়ছে তার প্রাণের তাগিদে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণে মত্ত। সেই পৈশাচিক উল্লাসের বিরুদ্ধে, অস্তিত্বের মর্মমন্ত্রে জেগে উঠেছিল এদেশের মুক্তিকামী সাধারণ অথচ প্রত্যয়ী মানুষ। গণমানুষের সেই মুক্তিকাঙ্ক্ষাই তাদের যোদ্ধা বানিয়ে দেয়। জনযুদ্ধের সেই অশ্রুসিক্ত বীরত্বগাথার উপাখ্যানে যারা মহান চরিত্র, গণমানুষের সেই আত্মত্যাগ, সাহসী স্বপ্নের দিন, দিনে দিনে বিস্মৃত প্রায় আজ। মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া, নিজে যখন গণযোদ্ধাদের একজন, এক অতলস্পর্শী সহমর্মিতায় তুলে ধরেছেন সেইসব যোদ্ধার অনালোচিত অধ্যায়, দৃপ্তকাহিনী। যার নেপথ্যে রয়েছে আত্মগত ভালোবাসা, অপরিসীম শ্রদ্ধা। *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা* তাই আমাদের আত্মোপলব্ধির উচ্চারণ, ফিরে দেখার দায়বদ্ধতা। সুচারু গ্রন্থনায় এ এক অবারিত সমাবেশ। যেমন তিনিই প্রথম বীরশ্রেষ্ঠদের যুদ্ধগাথা লিখেছেন– আবার নাম না জানা, অজস্র অচেনা তবু সমধিক বীরের কাহিনীও তিনিই রচনা করেছেন এই গ্রন্থে-*জনযুদ্ধের গণযোদ্ধায়*।

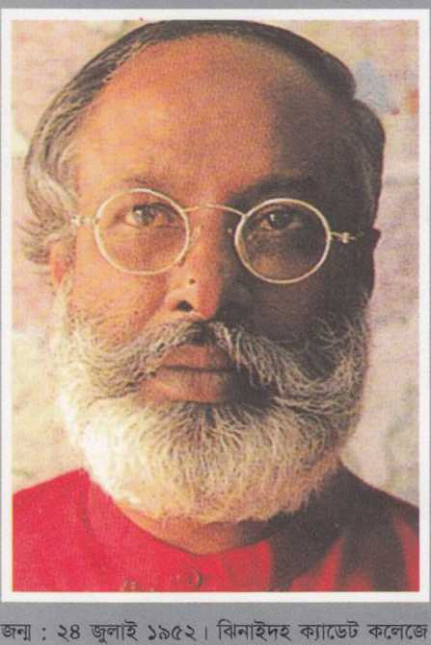

জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এল মুক্তি সংগ্রামে। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলিতে। একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিজেকে শাণিত করেছেন স্বদেশপ্রেমের এক প্রাগঢ় চেতনায়। বাহাত্তরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পচাত্তরের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১২ জুলাই ১৯৯৬ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন-এ যেমন উচ্চ শ্লাঘার, একমাত্র পুত্র শিশু সাবিতের মৃত্যু তেমনি তার হৃদয়ের গভীরতম ক্ষত। তবুও এ ক্ষত নিয়ে, এই বিক্ষত সময়ে তিনি সবুজআদৃত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তার অপরাপর গ্রন্থের নাম– *বিজয়ী হয়ে ফিরব নইলে ফিরবই না, ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স কমান্ডার–খালেদের কথা, স্বাধীনতা* (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা, *তাগড়া* (মুক্তিযুদ্ধের শিশুতোষ কমিক বই)।

জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

সেইসব অকুতোভয় সহযোদ্ধাদের
যাঁদের নামে এই বইয়ের নাম

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বর্ধিষ্ণু জনপদের ধ্বংসলীলা, উৎপীড়িত জনগণের প্রবল বিদ্রোহ বা মাতৃভূমির উপর বন্যবর্বর জাতির আক্রমণের মতো বিরাট ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যদি কেউ পায়, তবে তার উচিত যা কিছু দেখেছে লিখে রাখা। ইতিহাসের ভাষা লিপিবদ্ধ করার নৈপুণ্য যদি তার না থাকে, লেখনীর ব্যবহার থাকে অনায়ত্ত, তবে তার উচিত কোনো অভিজ্ঞ লিপিকারের কাছে সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা। লিপিকার লিখে রেখে পৌত্র-প্রপৌত্রদের শিক্ষার নিমিত্তে তা অক্ষয় করে রাখবেন।

—ভ. ইয়ান, *'চেঙ্গিস খাঁ'*

লেখকের কথা

একাত্তরে আমি ছিলাম ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী। যুদ্ধে গেলাম তখন। আমিও তাই হাজারো গণযোদ্ধাদের একজন। জনযুদ্ধের গণযোদ্ধাদের প্রতি আমার স্পর্শকাতরতার এটিও একটি কারণ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলতে বা লিখতে গেলে জনগণের ভূমিকা সম্বন্ধে সচরাচর যা বলা হয়, তা হলো—বাংলাদেশের ছাত্র, কৃষক, জনতা, পেশাজীবী শ্রেণীগোত্র নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর আলোচনার চরিত্র ক্রমাগত সীমিত হয়ে আসে অল্প কিছু রাজনৈতিক নেতা, কিছু সামরিক ব্যক্তিত্ব, কিছু বুদ্ধিজীবী এবং আরও অল্প কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে। সাড়ে সাত কোটি জনগণের জন্য বরাদ্দ রইল ওই একটি লাইন, কখনোবা একটি প্যারাগ্রাফ বড়জোর। ঐতিহাসিকরা গ্রহণের চেয়ে বর্জন করেন বেশি—অমলেশ ত্রিপাঠির এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। ইতিহাস লিখতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক সব ঘটনা তো লিখতে পারেন না; যে সব ঘটনা তিনি ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ব'লে বিবেচনা করেন, তাই শুধু গ্রহণ করেন। এই পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর করছে ঐতিহাসিকের মনন ও মনস্তত্ত্বের ওপর। জনযুদ্ধের এসব গণযোদ্ধা, ঐতিহাসিকদের গ্রহণ-বর্জনের যে ছাকনি, তার ভেতর দিয়ে বার বার নিচে পড়ে গেছে। তারা না পেরেছে নিজেদের কথা লিখতে, না পেরেছে ঐতিহাসিকদের কলমে বা কথায় উঠে আসতে। অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং সমাজের নিচুতলার এ যোদ্ধারা স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজেরাও তাদের সেই লড়াইয়ের কথা কোথাও বলতে পারেনি। এ সুযোগ হরণ করে নিলো রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও সামরিক বাহিনীর কিছু মুক্তিযোদ্ধা।

সরকারি উদ্যোগে সংগৃহীত আমাদের 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিলপত্র' প্রশংসার দাবি রাখে। হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পে' নথিপত্র, যোদ্ধাদের বিবৃতি প্রভৃতি ক্রমানুসারে সাজানো আছে। পাঠক, গবেষক তার প্রয়োজনটুকুতে আগ্রহী হবেন এবং যা বোঝার বুঝে নেবেন। সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের পরিমিতিবোধ এক অতীতীত ব্যাপার। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন। কেউ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ এ যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা নিয়ে

AMARBOI.COM

গবেষণা করেছেন, কেউ দেখিয়েছেন তখনকার বাংলাদেশকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে। কোনো কোনো আত্মম্ভরি যোদ্ধা শুধু বলেছেন—আমি, আমি এবং আমিই সবকিছু। কেউ বলেছেন, পেশাদার সৈনিক মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম কেবলই বেতন-ভাতা, রেশন, বাসস্থান ও বিধিবদ্ধ সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বাঁধা। ভারতীয় বাহিনীর জেনারেলরা লিখেছেন নিজেদের ফর্মেশন ও ইউনিটগুলোর শৌর্যবীর্য নিয়ে। মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা সেখানে নিতান্তই গৌণ। এত সবকিছুর মধ্যে বাদ প'ড়ে গেছে আমাদের দেশের, আমাদের অ-শহুরে যে সব সাধারণ মানুষ অসীম সাহস প্রদর্শন করেছিল সম্মুখযুদ্ধে, তাদের কথা। আমি ইতিহাসের ছাত্র নই এবং সাব-অলটার্ন হিস্টরির জটিলতা বোঝার প্রয়োজনও আমার নেই। আমি শুধুই একজন মুক্তিযোদ্ধা। আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তো ইতিহাসের এক বিশাল প্রেসার চেম্বার; সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একেবারে একাকার করে ফেলেছিল এ যুদ্ধ। সম্মুখসমরের গণযোদ্ধাদের প্রায় সবাই ছিল গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষ, ছাত্র, শ্রমজীবী—ছিল পকেটমার, চোরাকারবারী, চরদখলের লড়াকু, সিঁধেল চোর, গেরস্থের কামলা। দেশ স্বাধীনের এ যুদ্ধে আমি নিজকে আবিষ্কার করলাম এদের মাঝে—এদের সাথে মিশে গিয়েই বুঝলাম মানুষ শুধু লম্বা হলেই বড় হয় না। এসব মানুষের সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। এরা বিনিময়ের কথা ভাবেনি এবং গ্রামের এই অশিক্ষিত, কিশোর-যুবকরা জীবন বিপন্ন করে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে। এরাই বাংলাদেশ। বড় অফিসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর সামনের কাতারের রাজনীতিবিদদের সম্মুখসমরে দেখা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম-শহরের এই সামাজিক প্রকৃতি খুঁজে পাইনি আমরা। এই বলবীর্যশালী গণযোদ্ধাদের আলোচনায় আনার তাগিদে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিশেষ করে মুক্তকণ্ঠের সাহিত্য সাময়িকী 'খোলা জানালা'য় খণ্ড খণ্ডভাবে যা লিখেছিলাম *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা* মোটামুটি তারই সংকলন। বিশাল অর্জনের ও অসীম বীরত্বের এখানে মাত্র অল্প কয়েকটি ঘটনা। আরো কেন বেশি যুদ্ধ, বেশি বীরত্বগাথা, বেশি উদ্দীপক ঘটনা সন্নিবেশিত করতে পারিনি—তা আমারই সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা।

মার্চ-ডিসেম্বর একাত্তরের স্বাধিকার ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ না জনযুদ্ধ—এ বিতর্ক থেকে বিনয়ের সাথে অব্যাহতি চাই। মাঠে যাদের যুদ্ধে পাইনি স্বাধীন দেশে শুভ্র কেশধারী সেইসব বুদ্ধিজীবী বা স্বাধীনতার ফসল জন্মগ্রহণকারী তত্ত্ব অন্বেষণকারীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আর ময়নাতদন্ত চাই না।

পেছনে ফিরে তাকালেই দুঃখ বাড়ে। একেকজনের দুঃখ একেকরকম। এ দুঃখটাও অন্যরকম। তিরিশের কোঠায় যে কৃষক স্ত্রী মিরাশের সাথে অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ ক'রে আজ স্বামী-সন্তান হারা পথের ভিখারি, ত্রিকোণায়, আখাউড়ার চোরাকারবারী বীর্যধারী যোদ্ধা তাজুল এখন আবার তার পুরাতন কাজই করছে, ট্রেনের পকেটমার ফজলু যুদ্ধ শেষে ময়মনসিংহের গৌরীপুর রেলস্টেশনে চা-বিস্কুটের দোকান করে, ফেনীর যুদ্ধাহত যোদ্ধা বীর প্রতীক তাহের হতাশায় পিজি

AMARBOI.COM

হাসপাতালের ওপর থেকে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করে (গত্যন্তর ছিল না। কারণ স্বাধীনতার পর ঘরে ফিরে দেখে পরিবারের সবাই খুন হয়েছে রাজাকারদের হাতে; ভিটেটিও দখলে গেছে তাদের)—এ যুদ্ধ, এ যোদ্ধাদের নিয়ে লিখতে কষ্ট লাগে। কত দীন হলে একটি জাতি তার মুক্তিযোদ্ধাদের এ অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে। যে দেশে বীরদের শ্রদ্ধা করা হয় না সে দেশে বীর তৈরিও হয় না। একটা কথা আছে—স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলা চায় না। এ প্রবচন আমাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি সত্য।

পাকিস্তানি কোনো লেখক, সামরিক বা বেসামরিক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লিখবে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশংসা করবে—আশা করা যায় না। পশুর কাছে যেমন মানবিক আচরণ কামনা করা অনুচিত। নিয়াজি, রাও ফরমান আলী, হাসান জহির, গুল হাসান, সাদউল্লাহ তাদের বইতে সেই একাত্তরের মনোবৃত্তিরই পুনঃপ্রকাশ করেছে। কিন্তু সত্যিই পরিতাপের বিষয়, সামরিক বা বেসামরিক, কোনো ভারতীয় লেখকও তা করেননি। নয় মাসের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধকে আমলেই নেননি তারা কেউ। মুক্তিবাহিনীর সামগ্রিক অর্জন ও কার্যকরী সহায়তার কারণেই মুখ্যত ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে মাত্র ৮ ডিভিশন সৈন্য দিয়ে পাকিস্তানের ৫টি পদাতিক ডিভিশনকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া এবং তাও মাত্র ১৩ দিন সময়ে। অথচ প্রচলিত যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী ৫ ডিভিশন শত্রুসৈন্যের বিপরীত ভারতীয়দের যুদ্ধে মোতায়েন করার কথা ১৫ ডিভিশন সৈন্য (আক্রমণের ক্ষেত্রে ১ : ৩ প্রচলিত আনুপাতিক হার অনুযায়ী)। ভারতীয় সেনানায়করা কোথাও তাদের বইতে লিখলেন না—মুক্তিবাহিনী কীভাবে শত্রুকে 'অন্ধ ও বধির' করে ফেলেছিল। লিখলেন না, তাদের পিটি-৭৬ উভচর ট্যাঙ্ক মেঘনা নদী সাঁতরিয়ে পার হতে পারছিল না যখন (আধা ঘণ্টা পানিতে চললে এ ট্যাঙ্কের ইঞ্জিন গরম হয়ে ইঞ্জিন সিজ হবার উপক্রম হয়) তখন গ্রামবাসী কী করে দেশি নৌকা দিয়ে টেনে এগুলোকে পার করে, কাদার রাস্তায় আশুগঞ্জ-ভৈরবের যুদ্ধে কীভাবে তাদের ভারি মর্টার, ভারি সরঞ্জাম গ্রামের লোক বয়ে নিয়ে গেছে তাদের জন্য, রংপুরের বদরগঞ্জে হারিকেন হাতে আমাদের ছেলেরা ট্যাঙ্কের সামনে হেঁটে হেঁটে ওদের পথ দেখিয়েছে। অথচ তারা লিখলেন কী করে ১.৮ : ১ আনুপাতিক সৈন্যের হারে তারা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। পাকিস্তানি এবং ভারতীয়দের একটি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন—বাংলাদেশীদের তারা কেউ প্রশংসা করেননি। বস্তুত, তাদের বাহ্যিক ও আপাতঃগোপন আচরণে বারবার মনে হয়েছে তারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, বাংলাদেশীদের নয়।

পাকিস্তানিরা ভারতীয়দের বেশি আপন মনে করল। কারণ ছিল। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না ক'রে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইল। এটা স্বাভাবিক। একটা নিয়মিত বাহিনী অনিয়মিত বাহিনীর (মুক্তিবাহিনী) কাছে আত্মসমর্পণ না ক'রে আরেকটি নিয়মিত বাহিনীর (ভারতীয় বাহিনী) কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইবে। চাইবে অবশিষ্ট আত্মসম্মানটুকু (?) রক্ষা করতে। কিন্তু যা অস্বাভাবিক তা হলো

AMARBOI.COM

আমাদের মিত্রবাহিনী হয়ে ভারতীয়রা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে আত্মসমর্পণের দলিল সম্পন্ন করল। বিজয়ের এ অভিষেকে আমরা অভিষিক্ত হতে পারলাম না। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা গৌরবই যেন ভারতীয়দের। যেন তাদের গৌরবেই আমরা গৌরবান্বিত হবো। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ ঘটনায় ম্লান হয়ে এলো যুদ্ধবিজয়ের সমূহ অহংকার।

কষ্ট পাই যখন দেখি, মুক্তিযুদ্ধ বলতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার ও সৈনিকরা ৪ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর যৌথবাহিনীর সর্বাত্মক যুদ্ধ (Final offensive) অধ্যায়ন করেন। বাকি যা সামান্য তা—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৮ম ও পরবর্তীতে ৯ম, ১০ম, আর ১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর তথা এস ফোর্স, কে ফোর্স, জেড ফোর্সের যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে গণযোদ্ধাদের নিয়েই অপ্রতুল এই পদাতিক ইউনিটগুলোর সৈন্যসংখ্যা পূরণ এবং পরের তিনটি ব্যাটালিয়ান গঠন করা হয়েছিল। নয় মাসের বাংলাদেশের ভেতরের নির্ভীক গণযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ অপ্রচলিত যুদ্ধগুলোর (Unconventional War) কোনো গবেষণা বা পঠন নেই আমাদের সেনাবাহিনীতে। অথচ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কত না অভিনব এবং নবউদ্ভাবিত রণকৌশল সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করেছে এই গণযোদ্ধারা। বস্তুত প্রায় এক লাখ বিশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা আর জনগণের সাথে একাকার হয়ে মিশে পেশাদার সৈনিকরাও জনযুদ্ধের গণযোদ্ধাই হয়ে গিয়েছিল।

আমরা যুদ্ধ করেছি, প্রশস্ত বুকে, ভয়শূন্য চিত্তে। এ যুদ্ধ করেছে সাধারণ মানুষ। এমন সাধারণ হ'তে অসাধারণ গুণাবলীর প্রয়োজন।

কবি আবু হাসান শাহরিয়ার এ বই লেখার তাগাদা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে রাগারাগিও করেছেন। তার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া আর কোনো প্রতিদানের ভাষা নেই। প্রকাশক অনুজপ্রতিম রহমতউল্লাহ রাজন সব সময়ই গালে হাসি টেনে আমার সব অনিয়ম ও অত্যাচার সহ্য করেছেন। তার ধৈর্যের সীমা অবাক হবার মতো। তার কাছে ঋণী রইলাম। এই বই লেখায় যে যোদ্ধাদের সাহায্য নিয়েছি বিভিন্নভাবে; তাদের লিখিতভাবে স্মরণ করতে গেলে তালিকা দীর্ঘ হবে। তারা নীরবে কষ্ট বয়ে চলেছেন। তাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত, অনেকেরই আবার ঠিকানা দেবার কোনো ঠিকানা নেই। সবার কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা।

অকুতোভয় যোদ্ধা মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম-এর অনুমতি নিয়ে তাঁর বই *রক্তেভেজা একাত্তর* থেকে দুটি ঘটনা এ বইয়ে উল্লেখ করেছি। শুধু এ অনুমতি নয়, তার অনুপ্রেরণার জন্যও তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আর সবচেয়ে উৎসাহিত হয়েছি আমি নতুন প্রজন্মের সেইসব কৌতূহলীদের দ্বারা, যাদের ইতিহাস-তৃষ্ণা আমাকে এই লেখাগুলো লিখতে, বই প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
জানুয়ারি, ১৯৯৯, ঢাকা

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটি প্রকাশিত হবার পর যে অপ্রত্যাশিত সাড়া পেয়েছি, তা আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। চেনা-অচেনা সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ ছুটেও এসেছেন যুদ্ধদিনের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে ধরেছেন তারা। মাঠের যোদ্ধাদের স্মৃতির সঞ্চয়ে এখনও রয়ে গেছে বাঙালির শ্রেষ্ঠতম অর্জনের মহত্তম কাহিনী। সে-ভাণ্ডার এখনও বিপুল। সেই সব কাহিনী নিয়ে আমার সামান্য লেখালেখির ধারাবাহিকতা আমি আমৃত্যু অব্যাহত রাখতে চাই। কারণ ইতোমধ্যেই তিরিশ বছর চলে গেছে। আর বড়জোর তিরিশ কি চল্লিশ বছর—তারপর সম্মুখ সমরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্য কেউ বেঁচে থাকবে না। যারা জানেন, তাদের বলতে দেয়া হয়নি; যারা জানেন না তারাই ব'লে ব'লে মুখে ফেনা তুলেছেন।

এই বই প্রকাশের তাবৎ সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি এ দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। তাদেরই বয়সে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। একই বয়সে আজ তারা মুক্তিযুদ্ধকে জানতে চায়। অথচ বছরের পর বছর এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা রণাঙ্গনের কল্পকাহিনী বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের মাঠে যাদের দ্যাখা যায়নি একটিবারও, তারাও মহাভারত-রামায়ণ রচনা করতে কম যাননি। এইসব সর্বভুক বুদ্ধিজীবীদের কবল থেকে একাত্তরের রণাঙ্গনের ইতিহাসকে রক্ষা করা না গেলে নতুন প্রজন্মের কাছে আমরা অপরাধী থেকে যাব। মোদ্দাকথা, সেই অপরাধবোধ থেকেই, একদিন যে হাতে হাতিয়ার ধরেছিলাম, সেই হাতে কলম তুলে নিয়েছি।

প্রথম মুদ্রণের কিছু প্রমাদ এই সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করেছি। তারপরও আশংকা—বইটিকে মুদ্রণপ্রমাদমুক্ত রাখা সম্ভব হল না।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
জানুয়ারি, ২০০১, ঢাকা

তৃতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

মাত্র দেড় বছরের ব্যবধানে *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা* বইটির দুটি মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হওয়ার সব কৃতিত্ব সেই সব পাঠকের যারা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এখনো জানতে আগ্রহী। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের কাছেই আমি ঋণাবদ্ধ। পরন্তু পাঠকের চাহিদা পূরণে কালবিলম্ব না করে তৃতীয় মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়ে দিব্যপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অনুজপ্রতিম মঈনুল আহসান সাবের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধারই পরিচয় রেখেছেন।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
মে, ২০০২, ঢাকা

AMARBOI.COM

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এই বইয়ের চতুর্থ সংস্করণের সময় আমি দেশের বাইরে ছিলাম। সেই চতুর্থ এবং বর্তমান পঞ্চম সংস্করণ যাদের আগ্রহের কারণে সম্ভব হয়েছে আবারো সেই পাঠকদের কাছেই কৃতজ্ঞতা। আগ্রহীদের তালিকায় দেশের অনেক শিশু-কিশোরও যুক্ত হয়েছে, যা আমার বড় পাওনা। এর পেছনে অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রমুখের লিখিত মূল্যায়নের যথেষ্ট ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি। ব্যক্তিগত পর্যায়েও অনেকে এই বইয়ের খবর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের সবার কাছেই আমি ঋণাবদ্ধ।
এই সুযোগে অনাগত সংস্করণের (যদি হয়) অনাগত পাঠকদেরও আগাম শুভেচ্ছা।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
অক্টোবর, ২০০৫, ঢাকা

ষষ্ঠ মুদ্রণের ভূমিকা

অক্টোবর, ২০০৫-এ লেখা পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় অনাগত সংস্করণের আগাম শুভেচ্ছা পাঠককে জানিয়ে ছিলাম আর কোনো ভূমিকা লিখবো না বলে। প্রকাশক, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অনুজপ্রতিম মঈনুল আহসান সাবের অপারগ হয়েই তার প্রকাশনা ব্যবসার ইতি টানছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। নতুন প্রকাশক 'সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ'। এ কারণেই আবারো ভূমিকা লেখা। সুযোগ বুঝে প্রচ্ছদও পাল্টে দিলাম। আঁকিয়ে রইলো আমাদের সেই ধ্রুব এষ-ই।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
ডিসেম্বর, ২০০৮, ঢাকা

AMARBOI.COM

সূচি

সাহসের ঠিকানা ১৭
নিরন্তর কাহিনীর এক যুদ্ধ ২২
ধূসর পাণ্ডুলিপি ৩৬
তাগড়া ৪১
গল্পও নয় ৪৭
শিশু মল্লিকা ও অবিমিশ্র দিগন্তের কাহিনী ৫১
রাখাইন মেয়ে প্রিন্‌ছা ৫৪
দুই পরদেশী ৫৯
মিরাশের মা এবং মদন থানার দুরন্ত ছেলেরা ৬৫
খণ্ডচিত্র একাত্তর ৭০
অন্যরকম সৈনিক ৮৬

সাহসের ঠিকানা

গেরিলা যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ আমাদের ২ নম্বর সেক্টরের অপারেশনাল অফিসার ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দার। ২৫ মার্চ বর্বর পাকিস্তানিদের দ্বারা কুমিল্লা সেনানিবাসে বাঙালি সৈনিকদের ওপর কাপুরুষিত আক্রমণ চলাকালীন সময় কুমিল্লা সেনানিবাসের ৩য় কমান্ডো ব্যাটালিয়ান থেকে পালিয়ে এসে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যোগ দিয়েছেন যুদ্ধে।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের একটি থানা মতিনগর। ২ নম্বর সেক্টরের অস্থায়ী সদর দপ্তর প্রথমে সেখানে স্থাপিত হয়। পাকিস্তানি ফিল্ড আর্টিলারি ফায়ারের আওতার ভেতরে থাকায় প্রায়ই পাকিস্তানি আর্টিলারির গোলা এসে পড়ত মতিনগর এলাকায়। তাছাড়া ভারতীয়দের সাথে তখনো সদর দপ্তর স্থাপনের স্থান নির্বাচনও চূড়ান্ত হয়নি। পরবর্তীতে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করা হয় মতিনগর-ত্রিপুরা সড়কের পাশে ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা বনাঞ্চল-মেলাঘরে। ২ নম্বর সেক্টরে যারা যুদ্ধ করেছেন তাদের কাছে সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ এবং ক্যাপ্টেন হায়দারকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। অনেকে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল ১ নম্বর সেক্টর আর ২ নম্বর সেক্টর তা প্রাণবন্ত করে রেখেছিল।' গেরিলা যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনায় খালেদ-হায়দার ছিলেন একটা অপূর্ব সংমিশ্রণ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং ফরিদপুরের বিশাল এলাকায় সফল গেরিলা অপারেশন তার স্বাক্ষর। ঢাকা শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী, জাতিসংঘের কর্মকর্তা ও বিদেশীদের কাছে ত্রাস সৃষ্টিকারী মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তি 'ক্র্যাক প্লাটুন' খালেদ-হায়দারেরই পরিকল্পনার ফসল। এসব এলাকার পাকিস্তানি সৈন্যদের মাঝে 'অন্ধকার ঘরে সাপ'-এর আতঙ্ক সক্ষমভাবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এই দুই যোদ্ধা। তাদের মেধার মাঠের জোগান দিয়েছিল ইস্পাত কঠিন চিত্তের কিছু তরুণ। এদের দেশপ্রেম এবং দ্বিধাহীন শৌর্যের দৃশ্যগুলো আজো যখন স্মৃতিতে ভর করে তখন নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হয়। মুক্তিযুদ্ধে নিজের ভূমিকা এদের বিশাল অবদানের কোনো অনুপাতই তখন আর গঠন করে না।

সেপ্টেম্বর মাস। মেলাঘরের সদর দপ্তরে মেজর খালেদ, মেজর মতিন এবং ক্যাপ্টেন হায়দার কী নিয়ে আলাপ করছেন। আমাকে মেজর খালেদ ডেকে

AMARBOI.COM

পাঠিয়েছেন কেন, আমি জানি না। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। ফিল্ড টেলিফোন বেজে উঠল। মেজর খালেদ ফোন ধরলেন। বোধকরি মনোযোগ চলমান আলোচনায় থাকায় তিনি টেলিফোনের আলাপে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। কে টেলিফোন করেছে জানি না। জানা সম্ভবও ছিল না। ক'সেকেন্ডের কথা শুনে খালেদ বললেন, 'সবাইকে চোখ বেঁধে রেখে দাও।' এরপর ঘণ্টা দু'য়েকের আলোচনা শেষে মেজর খালেদ ক্যাপ্টেন গফ্ফারের সাব-সেক্টর সদর দপ্তর কোণাবন যাবেন। আমাকে বললেন গাড়িতে উঠতে। M-38 খোলা জিপের পেছনে উঠে বসলাম। গাড়ি মেইন আর পি (Regimental Police) চেক পোস্ট পার হয়ে ১৫-২০ গজ পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ খালেদ গাড়ি পেছাতে বললেন। চোখ বাঁধা অবস্থায় ৮/৯ জন ১৪/১৫ বছরের কিশোর। খালেদ আর পি হাবিলদারের কাছে জানতে চাইলেন, কেন এদের চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে। আর পি হাবিলদার জানাল, 'স্যার, আপনিই তো এদের চোখ বেঁধে রাখতে বলেছেন।' খালেদের এবার হয়তো মনে পড়ল; আদেশ দিলেন ওদের চোখ খুলে দিতে। জিজ্ঞাসা করলেন ওদের, ওরা কী চায়। মুহূর্তের মধ্যে সবগুলো কিশোর ক্রোধে খালেদের ওপর ফেটে পড়ল। এরা আর্মি চেনে না, এরা মেজর চেনে না, এরা সেক্টর কমান্ডার কী জানে না। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি আমাদের চোখ বাঁধার হুকুম দেবার কে? আপনার সাথে যুদ্ধ করতে না দিলে আমরা অন্য জায়গায় যুদ্ধ করব। বাংলাদেশ কি একা আপনার?' খালেদ হাসছেন। এ হাসির অর্থ আছে। এ হাসি আত্মবিশ্বাসের হাসি। এ হাসির অর্থ—এ প্রত্যয়ী জাতির যেভাবেই হোক, যতদিনেই হোক যুদ্ধে বিজয় অনিবার্য। এই কিশোরদের দিয়েই 'স্টুডেন্ট কোম্পানি' এলাকায় সেদিনই সাময়িকভাবে ১৮০ পাউন্ড তাবু লাগিয়ে খালেদ তৈরি করলেন 'ওয়াই প্লাটুন' (Young Platoon)। ২১ পাউন্ড ওজনের বৃটিশ .৩০৩ ব্রাউনিং (এলএমজি) এরা তুলতে পারত না, কিন্তু তারপরও এদের অসাধ্য এমন কিছুই ছিল না। যে কারণেই হোক খালেদ এবং হায়দারের স্নেহভাজন ছিলাম এবং সেই সুবাদে এঁদের সাথে কাজ করবার, থাকবার এবং ঘুরবার সুযোগ ছিল। দেখতাম এই কিশোরদের খালেদ পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের ব্যাংকার দেখিয়ে বলতেন, 'যারা আমার সামনে শত্রুর ঐ ব্যাংকারগুলোর ভেতর গ্রেনেড ফেলে আসতে পারবে তাদের জন্য পুরস্কার এই ঘড়ি'। ঘড়ি পুরস্কারের জন্য নয়, অদম্য সাহস আর কী প্রবল দেশাত্মবোধ ছিল এ কিশোরদের। এ আদেশ শুনে প্রথম দিন খালেদকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। কিন্তু না। দিনের আলোয় আমাদের সবার সামনে পাকিস্তানি ব্যাংকারগুলো প্রকম্পিত করে ধুলার আঁধার বানিয়ে ফেলল এরা। অশ্রুসিক্ত চোখে খালেদ ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। এ যেন এক পিতা তার সন্তানদের কাঁধে ওজন রেখে হাঁটতে শেখাচ্ছেন। মাত্রায় কে বড়, তার বিচারের কোনো অবকাশ নেই। আমার ছোট মেয়েটি আজ ওদেরই বয়েসি। আমি ভাবি আর অবাক হই। একাত্তরের ঐ কিশোরদের কীর্তি কি আসলেই সত্যি ছিল?

AMARBOI.COM

গেরিলা দলগুলো বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের আগে মেজর খালেদ বা ক্যাপ্টেন হায়দার কিংবা উভয়েই ব্রিফ করতেন। ছেলেরা বাংলাদেশে আসার জন্য, পাকিস্তানি ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। ব্রিফিং-এর সময় যোদ্ধাদের দীপ্ততার দৃশ্য স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব। আজো সে সব স্মৃতি আমাকে যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। দু'হাতের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে আমি আজ এক বৃদ্ধ ঘোড়া যে তার যৌবনের দৌড় ২৮ বছর আগেই দৌড়ে এসেছে। এমনই এক ব্রিফিং-এর সময়ের কথা বলছি।

ছেলেটির নাম তৈয়ব আলী। লেখাপড়া নেই; থাকলেও খুবই সামান্য। শক্ত গঠন এবং কিঞ্চিৎ স্থূল গড়নের বেটেখাটো এই ছেলেটি ক্যাপ্টেন হায়দারের কাছে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় তাকে একটি এলএমজি দেবার জন্য রীতিমতো অনুনয় করতে লাগল। অপারেশন রুমের (Operation Room) পাশে আমরা অনেকেই দাঁড়িয়ে। এলএমজি তখন একটি দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র। তাছাড়া এই অস্ত্রটি ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটেল (CQB) অস্ত্র নয় এবং এটিকে সহজে লুকানো যায় না বলে সাধারণত গেরিলা দলকে এ অস্ত্র প্রদান করা হয় না। তৈয়ব আলী এমন সরলভাবে ক্যাপ্টেন হায়দারের কাছে আকুতি মিনতি করতে লাগল যেন ক্যাপ্টেন হায়দার ইচ্ছে করলেই তাকে এটি দিতে পারেন, কিন্তু দিচ্ছিলেন না। হায়দার মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন, 'যুদ্ধ আগে কিছু করো, এলএমজি পাবে।' কিছুদিন পর তৈয়ব আলী গামছায় বেঁধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মিলিটারি পুলিশের এক ক্যাপ্টেনকে হত্যা ক'রে তার ব্যাজেজ অফ র‍্যাংক, সাদা বেল্ট, লাল টুপি, বুট, পাউচ্‌সহ পিস্তল এনে ক্যাপ্টেন হায়দারের সামনে উপস্থাপন করল। 'স্যার যুদ্ধ কইরা আইছি, এইবার এলএমজি দ্যান।' তৈয়ব আলী তার অনুরোধে পুরোমাত্রায় আন্তরিক।

তারও বেশ কিছুদিন পরের কথা। ২ ইঞ্চি মর্টার এবং এনারগা-৯৪ (Energa-94) রাইফেল গ্রেনেড ফায়ারিং-এর ডেমনস্ট্রেশন এবং অনুশীলনের জন্য ক্যাপ্টেন হায়দার আমাদের নিয়ে গেলেন মধ্য-সমতল এলাকার এক পাহাড়ি অঞ্চলে। প্রথমে কয়েকটা এনারগা-৯৪ গ্রেনেড ফায়ার করা হলো পাহাড়ে লক্ষবস্তু স্থাপন করে। ২ ইঞ্চি মর্টার বস্তুত কোনো কার্যকরী যুদ্ধাস্ত্র নয়। ২ ইঞ্চি মর্টারের ব্যবহার মেশিনগান এবং রিকয়েললেস রাইফেলের[১] লোকাল প্রটেকশন ও আক্রমণ শেষে বিভিন্ন রং-এর গোলা ফায়ার করে সংকেত দেয়ার জন্য। এর রেঞ্জ মাত্র চারশ গজ। তবুও যেহেতু দুষ্প্রাপ্য, তাই বোধকরি তৈয়ব আলীর লোভ হলো ২ ইঞ্চি মর্টারের প্রতি। আবার ক্যাপ্টেন হায়দারের কাছে আকুতি তাকে একটা ২ ইঞ্চি মর্টার দেবার জন্য। তৈয়ব আলীর কথা এবং কাণ্ড কারখানায় শুধু ক্যাপ্টেন হায়দারই নন আমরাও খুব মজা পেতাম। হায়দার আবার হাসতে হাসতে তৈয়ব আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলোতো ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা কতদূর যায়?' তৈয়ব আলী সামনের পাহাড়ের নিচে ছোট একটি চারা গাছ দেখিয়ে বলল,'স্যার অমন ওদ্দুর যাইব।' চারশ/সাড়ে চারশ গজ। জবাব শুনে ক্যাপ্টেন হায়দারের গালের

১. রিকয়েললেস রাইফেল : ধাক্কাবিহীন ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী অস্ত্র

AMARBOI.COM

কোণা প্রায় কানের লতির সাথে লাগার উপক্রম। হাসি কোনোরকম থামিয়ে বললেন, 'যাও, যদি বলতে পার কীভাবে মারলে অতদূর গোলা যাবে, তবেই তোমাকে মর্টার দিব'। মজার উত্তর এলো এখন তৈয়ব আলীর কাছে থেকে, 'স্যার, হোতাইয়াও না, আবার খাড়া কইরাও না'। বাম হাত আড়াআড়ি ক'রে রেখে ডান হাত তার ওপর বাঁকা ক'রে বলল, 'এইরকম স্যার, মাঝামাঝি।' অপূর্ব! ঠিক ৪৫ ডিগ্রি এ্যাংগেল। Theory of Samll Arms Fire, High Trajectory Weapon Training, Calculus পড়বার কোনো প্রয়োজনই রইল না। যুদ্ধের সময় তৈয়ব আলীর সাথে আমার আর দেখা হয়নি।

১৯৭৫ সালে আমার ইউনিট, ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন ঢাকায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে (Operation-Black Panther) নিয়োজিত। যুদ্ধোত্তর সেনাবাহিনীর অসংখ্য সীমাবদ্ধতা নিয়ে এ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। ইউনিটের দক্ষতার তুলনায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অনেক বেশি এলাকা জুড়ে। জুনিয়ার অফিসার হিসেবে সিনিয়ারদের স্বভাবজাত 'আরোপিত দায়িত্ব'ও আসে আমার ওপর। সবচেয়ে বড় কথা, সাফল্যের মাপকাঠি হলো কোন ইউনিট বা কোন কোম্পানি কত বেশি অস্ত্র উদ্ধার করতে পারে তার ওপর। মোটামুটি দিনরাত এক ক'রে পিঁপড়ার ব্যস্ততা তখন আমার। তারপরও সাফল্য খুবই সামান্য।এমনই এক সময় তৈয়ব আলী আমার ক্যাম্পে এসে হাজির। 'ভাই আপনাগো আর্মির লোকেরা হাতিয়ারের খোঁজে বাড়ি বাড়ি যাইতাছে। যুদ্ধের সময় আমরা যে পাইয়াগো একটা গানবোট ফালাইছিলাম হেইডার একটা মিটার কিন্তু আমি বাড়িত রাইখ্যা দিছি। হেই মিটার কিন্তু আমি দিমু না।' ভাবলাম, হায়! তৈয়ব আলীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আর্মি স্বাধীনতার পর কীভাবে আমাদের আর্মি হয়ে গেল। উপলব্ধি করলাম, 'স্বাধীনতা' তৈয়ব আলীদের আর আমাদের মধ্যে সত্যিই একটি বাস্তব বিভাজক। যদিও যুদ্ধকালীন সময় আমরা ছিলাম একই কাতারে। জাহাজের কী ধরনের মিটার, আমিও ধারণা করতে পারলাম না। যেহেতু অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক ও মারণাস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু উদ্ধার আমাদের কাজ নয়, কাজেই কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'মিটারটা তুমি আমার এখানে নিয়ে এসো। আমি আবার তোমাকে দিয়ে দেব। কেউ তোমার এটা নেবে না।' পরে দেখলাম জাহাজের দিক-নির্দেশনার জাইরোকম্পাসের (Gyrocompass) একটি রিপিটার (Repeater)। মুক্তিযুদ্ধের বীর প্রতীক তৈয়ব আলীর কাছে যুদ্ধের এই স্মারক (War Booty) তার গর্বের স্বাতন্ত্র্য। এই গর্বের অধিকারে আমি কেন, কারোরই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা থাকবার ক্ষমতাও থাকা উচিত নয়।

তিরানব্বই সাল। আমি তখন সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে নিয়োজিত। তৈয়ব আলী কয়েক মাস পর পর হঠাৎ একদিন এসে উদয় হয় অফিসে। কোনো অনুরোধ নেই, তদবীর নেই, সুপারিশ নেই। এমনিতেই আসা। নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই তারপরও তার প্রচণ্ড ব্যস্ততা। পরনে তার সেই পুরানো পোশাক-লুঙ্গি আর হাফ শার্ট। আর আছে সবসময়ের মত একনাগাড়ে কথা বলে চলা। বিষয় আর কিছুই নয়, ঘুরে ফিরে সেই একাত্তর—সেই মুক্তিযুদ্ধ।

AMARBOI.COM

যুদ্ধ শুরুর আগে তৈয়ব আলী বিভিন্ন ফল-ফলাদি মাথায় নিয়ে ফেরি করত ঢাকার রাস্তায়। মেজর খালেদ মোশাররফ বলেন, 'ঢাকা শহরের এক ফল বিক্রেতা আমার সেক্টরের একজন গেরিলা কমান্ডার হয়েছিলেন'।[১] এই ফল বিক্রেতাই আমাদের তৈয়ব আলী কমান্ডার নামে খ্যাত। অফিসে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী কার বক্তব্য গ্রহণ করা হচ্ছে, না কার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আর সাক্ষ্য আইন মনোযোগের সাথে ঘাটছি এসব কিছু ভাববার কোনো বিষয়ই নয় তৈয়ব আলীর। সব বন্ধ করে তার বক্তব্য শুনতেই হবে। এ যেন তার অর্জিত অধিকার। একদিন অবসরে তৈয়ব আলীর অনর্গল কথা বলা অবিরাম শুনে যাচ্ছি। এক সময় ফুরসতে তৈয়ব আলীকে বললাম, 'তোমাদের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে একটা বই লেখা শুরু করেছি। ছাপা হলে দেব, পড়ো'। তৈয়ব আলী হঠাৎই ক্ষেপে উঠল আমার প্রস্তাব শুনে, 'আপনাদের এসব বই পড়তে আমার একদমই ভালো লাগে না। যুদ্ধের সময় একটাই বই পড়েছিলাম। সেই বই কালি-কলমে লেখা নয়, সেই বই লেখা রাইফেল আর রক্তে। সে বই পড়ার পর আপনাদের এসব রচনা পড়তে আমার আর ইচ্ছা হয় না'।

তৈয়ব আলীকে তার ভালো না লাগা বই জোর করে পড়ানোর সুযোগ সে আর আমাকে দেয়নি। নিরানব্বইয়ের ফেব্রুয়ারি মাসে এ বই বেরুনোর আগেই সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে ওপারে।

ভুরুঙ্গামারীর ইমান আলী, লালমাটিয়ার আবদুল আজিজ, মাদারটেকের তৈয়ব আলীরা একে একে চলে যায় আর বার বার ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়—আমাদের এ আসা তো যাবার জন্যই।

শান্তির সময়ের সৈনিক আর যুদ্ধের সময়ের সৈনিকের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। তৈয়ব আলী আমাদের যুদ্ধের সময়ের সৈনিক। একে দিয়ে 'গার্ড অব অনার' দেয়া যাবে না, দেয়া যাবে জাতির ক্রান্তিকালে অর্ঘ। ইতিহাসের শিক্ষক জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ ভিয়েতনামের এমনই এক তৈয়ব আলী।

দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সাবসিডিয়ারি ক্লাস করতে আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে হেঁটে হেঁটে কার্জন হলে যাই। লেখাপড়ায় মনোযোগের চেয়ে অমনোযোগই বেশি। এই যাতায়াতের মাঝে হাইকোর্টের গেটের কাছে বটতলায় লোহার শেকল পরা উর্ধলস্করত বা গাঁজার কলকিতে টান দিয়ে বুঁদ হয়ে থাকা 'নূরা পাগলা'কে দেখতে যাই। হঠাৎ একদিন তৈয়ব আলীর সাথে দেখা। তৈয়ব আলীর সেই সহজ সরল কথাবার্তা। 'ভাই, কিছু লাগবনি? লাগলে কইয়েন। বিহারীগ পঞ্চাশটা বাস আর ট্রাক দখল করছি, আরো আছে। যা কন তাই দিবার পারুম, খালি ইংরাজি কথা কইতে কইয়েন না।'

আমার বাস, ট্রাক বা তৈয়ব আলীর মুখে ইংরেজি শোনা কোনো কিছুরই দরকার ছিল না। আমার এবং আমার দেশের দরকার কেবল একাত্তরের তৈয়ব আলীদের—জাতির ক্রান্তিকালে যারা কালো মেঘের পেছনে সূর্যরেখা।

১. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৭৩

AMARBOI.COM

নিরন্তর কাহিনীর এক যুদ্ধ

প্রতিরক্ষার ধারণা ও মৌলিক বিবেচনাসমূহের প্রতি একরকম অসম্মানই প্রদর্শন করা হয়েছিল এ প্রতিরক্ষায়। একাত্তরের অক্টোবর মাস। এখন অবশ্য যুদ্ধের ওপর কিছু জানার পর উপলব্ধি করেছি যে, সে অসম্মান ছিল নিতান্তই অর্বাচীনের কাজ। ক্যাডেট কলেজে দুই বছর সামরিক বিজ্ঞান পড়া দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থী একটি উনিশ বছরের যুবকের কাছে এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না। যে উদ্দেশ্য ও প্রেরণা গোটা জাতিকে স্বাধিকার অর্জনের যুদ্ধে লিপ্ত করেছিল, আমাদের প্রতিরক্ষাটাও ছিল তেমনি এক প্রত্যয়ী আবেগের ফল। তারপরও অবশ্য অনেক কথা আছে।

কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কে ১৮ মাইল কোম্পানীগঞ্জ। কোম্পানীগঞ্জ থেকে কাঁচা রাস্তার প্রায় ১৩ মাইল নবীনগর। নবীনগর পৌঁছতে নৌপথ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না। নবীনগর তাই তখনো শত্রুমুক্ত। নবীনগর দখলের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানিরা কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়কটি পাকা করার পরিকল্পনা নিয়ে ইট বিছাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন হায়দার এক সকালে মেলাঘরে ২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তরে আমাকে ডেকে বললেন, কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়কটি পাকা করার কাজ বন্ধ করতে হবে। কারণ :

ক. ২ নম্বর সেক্টরের প্রধান যাতায়াত পথ (Induction Route) ভারতের মন্তলা বা কোণাবন, আখাউড়ার মনিয়ন, আখাউড়ার দক্ষিণে রেল কালভার্টের নিচ দিয়ে উজানীশ্বরের বিল, বিল পার হয়ে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কে তন্তর সেতুর নিচ দিয়ে অদের খাল। অদের খাল মালাই বাঙ্গোরা বাজারের কাছে কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়ক বিভক্ত করে রামচন্দ্রপুর এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থান সংযোগ করে। কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ ছাড়া ঢাকা, ফরিদপুর এবং ২ নম্বর সেক্টরের বাকি এলাকাসমূহের পৌঁছবার এটাই ছিল প্রধান পথ। কাজেই কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়কটি পাকা করা হলে এই গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াত পথটি বন্ধ হয়ে যাবে।

খ. যেহেতু নৌ পথ ছাড়া নবীনগর পৌঁছানোর কোনো বিকল্প পথ ছিল না, সেহেতু নবীনগর ছিল তখনো মুক্তাঞ্চল। সড়কটি পাকা হলে নবীনগর থানায় নিশ্চিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ঘটবে।

AMARBOI.COM

গ. তৃতীয় কারণটি একটু লজ্জাকর। পাকিস্তানি সেনাদের উপস্থিতিতে উল্লসিত হয়ে আমাদের বহু মুরুব্বী পাকিস্তানিদের বহুবিধ সেবায় ব্যস্ত হয়ে যাবেন। এই সেবায়েতদের সংখ্যা যত কম রাখা যায় ততই মঙ্গল।

পরে দেখলাম সদস্য নির্বাচন, অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক, মাইন ইত্যাদির ব্যবস্থা ক্যাপ্টেন হায়দার আগে থেকেই করে রেখেছেন। চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ। বাংলাদের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণের মুখে কীভাবে দাউদকান্দি-ময়নামতি সড়ক বিস্ফোরক ও মাইন ব্যবহারে অকেজো করে দিতে হবে, বললেন তিনি। বললেন কবে নাগাদ চূড়ান্ত আক্রমণ (Final Offensive) রচনা করা হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে দাউদকান্দি-ময়নামতি সড়ক যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা (Line of Communication) তা ব্যবহার অযোগ্য করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা। বললেন আরো অনেক কথা।

কোম্পানীগঞ্জ থেকে নবীনগর যেতে মাইল তিনেক পরে রাজা চাপিতলা গ্রাম। শুধু চাপিতলা বললেই যে কেউ অবশ্য চিনিয়ে দেবে। আরশি নদী চাপিতলার ভেতর দিয়ে কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়কটি পূর্ব-পশ্চিমে অতিক্রম করে। আরশি নদী বর্ষায় খরস্রোতা ও বেশ গভীর। প্রস্থ ৮০/৯০ ফুট। শুরুতে যে প্রতিরক্ষাটির বৈশিষ্ট্য দিয়ে আলোচনার অবতারণা করেছিলাম, সে প্রতিরক্ষাটির অবস্থান ছিল এই আরশি নদীর উত্তর তীরে। পশ্চিমা সামরিক সমালোচকদের কেউ কেউ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে যাবার দক্ষতা অর্জন করবার পূর্বেই বহু স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে জয়ের চেয়ে পরাজয় বরণ করেছে বেশি। সামগ্রিক পরিকল্পনাগত ত্রুটি ও স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর মনোবলের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে সমালোচকরা বলেন যে, অনেক সময় তাতে ক্ষতি হয়েছে মারাত্মক। আটাশ বছর আগে কী বিবেচনায় প্রধানত গণযোদ্ধাদের নিয়ে এই প্রচলিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাই বলি। তবে সময় যে বিচার করবে, তার জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন।

ক. কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়ক তৈরি বন্ধ করা যেত :

০১. প্রথমত, সড়ক তৈরির কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকদের নাজেহাল, বন্দি বা হত্যা করার মাধ্যমে।

০২. এবং দ্বিতীয়ত, পেশী প্রদর্শন করে সড়ক তৈরির কাজ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিরত রাখার মাধ্যমে। আমরা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিলাম। কেননা এক কথায় পাকিস্তানিদের ওপরকার রাগ আমরা আমাদের দেশি শ্রমিক ভাইদের ওপর মেটাতে চাইনি। আর পাকিস্তানিদের ফেলা থুথু আমরা তাদের দিয়েই গেলাতে চেয়েছিলাম।

খ. শত্রুকে নিজস্ব সুবিধামতো নির্বাচিত স্থানে এনে তার সমূহ ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা।

AMARBOI.COM

গ. এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে একটা ভাল ফলাফল লাভ করা।

০১. পাকিস্তানিদের এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানকে মানসিকভাবে সহায়তা করা।

০২. পাকিস্তানিরা আগস্ট মাসের পর থেকে আগের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে চলাফেরা কমিয়ে আনে, তাই অপ্রচলিত যুদ্ধে শত্রুকে নাজেহাল করার সুযোগ হ্রাস পাচ্ছিল। কাজেই প্রতিরক্ষামূলক একটি যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে জয়ী হওয়া।

০৩. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 'ভিত্তি ফৌজ'দের দুটি করে গ্রেনেড দিয়ে তা পাকিস্তানি সৈন্য বা সরঞ্জামের ওপর ছোড়াবার জন্য পাঠানো হয়। তাদের কেউ কেউ এলাকায় সত্যিকার অর্থে ডাকাতে পরিণত হয়েছিল। সে লজ্জা ঢাকার জন্য এলাকাবাসীদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য স্বচক্ষে দেখানো।

০৪. এলাকাবাসী মুক্তির জন্য ইতোমধ্যেই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছিল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল আরো ত্যাগের, এ কথা আমরা জানতাম। জানতাম, এ যুদ্ধে কেউ রানার-আপ হবে না। মাসের পর মাস এ এলাকার গরিব গ্রামবাসী আমাদের আহার, আশ্রয় এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাদের কাছে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করা ক্রমাগত আবশ্যক হয়ে পড়ছিল।

০৫. পাকিস্তানি বাহিনীর একটা মেকি অহমিকা ছিল—তারাই এশিয়ার শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবাজ। অঞ্চলভিত্তিক সীমিত যুদ্ধে তাদের তা প্রমাণ করবার সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। পাকিস্তানি ও তাদের সেবায়েতদের সাময়িকভাবে এলাকার মোটামুটি নির্জীব রাখাও ছিল উদ্দেশ্য। নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতির জন্য আমাদের সময়ের প্রয়োজন ছিল বড় বেশি।

০৬. কুমিল্লা জেলার এ এলাকায় নভেম্বর মাস পর্যন্ত জমিতে পানি থাকে। জলে বা জলপথে শত্রুকে পাওয়া ভারি আনন্দের ব্যাপার। শত্রু যেদিক দিয়েই আসুক (একমাত্র কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়ক ছাড়া) পানি অতিক্রম তাদের করতেই হবে। চাপিতলায় আরশি নদীর ওপর পাকা সেতুর দু'ধারের প্রায় ২০ ফুট করে মাটি কেটে নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম যাতে শত্রু এটি ব্যবহার করতে না পারে। তার তাছাড়া সেতু এলাকা ক্ষুদ্রাস্ত্রের কার্যকরী ফায়ারের আওতায় রাখা হয়েছিল যেন শত্রুপক্ষ কারিগরী কৌশল (Engineering Effort) কাজে লাগিয়ে সেতুটি ব্যবহারযোগ্য করে যুদ্ধকে প্রভাবিত করতে না পারে।

০৭. সর্বোপরি শত্রুর শক্তি কোনোভাবেই এতদঞ্চলে আমাদের চেয়ে বেশি হতে পারবে না কিছু মর্টার, মেশিনগান আর রিকয়েললেস রাইফেল ছাড়া। তেমন একটা হিসেব করে ফেলেছিলাম বিশ্লেষণ করে। এ ভুল বিশ্লেষণের জন্য আমাদের অবশ্য অল্পই মাসুল দিতে হয়েছিল।

AMARBOI.COM

একটা বয়স আছে যখন উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা সমবয়েসীদের সাথে নিজেদের দলভুক্ত না করে বড়দের সাহচর্য পেতে চায়। তেমন একটা মনস্তাত্ত্বিক ভাবের বলয় এ প্রতিরক্ষার অবস্থান গ্রহণের পেছনে কিছুটা হয়তো আমাদের মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে। ত্রিপুরার মেলাঘর থেকে দুদিন পরে বাংলাদেশ যাত্রা করব। সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ। তদানীন্তন ইপিআর-এর এক হাবিলদার, মোঃ রমিজউদ্দিন তার ২১ বছর চাকরির দোহাই দিয়ে আমাকে অনুরোধ করল তাকে আমাদের সাথে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে। আমি তার এই আগ্রহের কারণ বুঝতে পারলাম, যখন সে বলল যে, তার বাড়ি আমরা যেখানে যাচ্ছি সে থানায়—কুমিল্লার মুরাদনগর। ভালোই লাগল ভেবে যে, একজন এনসিও[১] পাওয়া গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন হায়দার রাজি হলেন না। এক শব্দের জবাব 'না' শুনে ফিরে এসে রমিজকে বললাম। রমিজ ক্রমেই বিনীত ভাষায় অনুরোধ করতে লাগল। তার বাবা-মা নেই, নেই একটি ছেলেও। দুই মেয়ে, বড় মেয়ে ৬/৭ বছরের ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্যাপ্টেন হায়দারকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করাতে তিনি আমাকে একটু সময় নিয়ে বোঝালেন। বললেন যে, এই সব বয়স্ক এনসিও নিয়ে সমস্যায় পড়ব। এদের পারিবারিক ঝামেলাও অনেক। তিনি বোঝাতে চাইলেন আমি যেন তরুণ ছেলেদের নির্বাচন করি। এদের পিছুটান নেই, পারিবারিক ঝামেলাও নেই। ক্যাপ্টেন হায়দার পূর্বেকার 'না' এবার যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু রমিজ যেন বুঝ মানবেই না। এক পর্যায়ে যখন তার দু'গাল বেয়ে চোখের পানি পড়তে লাগল, বাধ্য হয়ে আমি ক্যাপ্টেন হায়দারকে আবারো অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে একচোট শাসিয়ে তার যাওয়ার অনুমতি দিলেন। শেষে বলে দিলেন যে এরপর এর বিষয়ে কোনো শৃঙ্খলা বরখেলাপের অভিযোগ তিনি আমার কাছে শুনতে চান না। এই রোগা, লম্বা হাবিলদার মোঃ রমিজউদ্দিন এ লেখার একটি মুখ্য চরিত্র। দ্বিতীয় চরিত্রটি মোঃ অহেদ আলী কেরানি। নামের শেষোক্ত শব্দটি তার দীর্ঘদিনের পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে পেশা থেকে শেষ অবধি সে অবসর গ্রহণ করেছে। গায়ের রঙ উল্লেখ করার মতো কালো। তার পরনের সাদা পায়জামা আর সাদা ফুল শার্টের জন্য হয়তো আর একটু বেশি কালো লেগে থাকবে। বয়স ৭২। এই চাপিতলারই হাজী মাঞ্জু ভূইয়া এক রাজাকাররত্ন। লোকটি দর্পভরে এলাকা কম্পমান করে ফেলেছিল তার প্রভুদের আশীর্বাদে। লোকটির সাংগঠনিক ক্ষমতা অসাধারণ। এই গ্রামের প্রায় সমস্ত সক্ষম লোককে সে রাজাকারে ভর্তি করেছে। এই লোকটির সাথে আল্লাহর এক সময়ের প্রিয় ফেরেস্তা ইবলিশের একটা সূক্ষ্ম মিল ছিল। সাময়িক ক্ষমতা তাকে এমনভাবে সম্মোহিত করেছিল যে, নিজেকে খোদা এবং তার হাতের লাঠিটিতে রাসুল বলে পরিচয় দিত। এটা অবশ্য শোনা কথা। তার জীবনের শেষাঙ্কটা একটু করুণ। মুক্তিযোদ্ধা 'নাপারা'দের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তাকে তার খোদগারীর যবনিকা টানতে হয়েছিল। আমাদের অহেদ কেরানির

১. এনসিও : নন-কমিশন্ড অফিসার

AMARBOI.COM

বাড়িও এই চাপিতলায়। যে গ্রামে আমাদের ক্যাম্প তার নাম পীরকাশিমপুর। একজন পীর সাহেব থাকেন এই গ্রামে—প্রচুর লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অর্ঘ নিয়ে। পীরকাশিমপুর বললে নিশ্চিত হতে পারবেন যে, আপনাকে কেউ অন্য কোনো কাশিমপুরে নিয়ে যাবে না। আমরা কাশিমপুরে পৌঁছেই পীর সাহেবের দোয়া নিয়েছিলাম। পাকিস্তানিরা ৭ নভেম্বর আমাদের প্রতিরক্ষার ওপর আক্রমণ করে। তার দুদিন আগে সকাল বেলা অহেদ কেরানি আমার সাথে দেখা করতে আসে। সেই তার সাথে আমার প্রথম দেখা। আশ্চর্য, লোকটি কোনো ভূমিকা ছাড়াই চাপিতলায় আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব ক'রে আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। খুব কড়া ভাষায় লোকটিতে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেয়া উচিত ছিল; কিন্তু দিইনি। রাগ সামলে আমি চলে এসেছিলাম। বিকালবেলা এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটে গেল। পীর সাহেব আমার টিনের দোচালা ছাপরা ঘরে বলা-কওয়া ছাড়া ঢুকে পড়লেন। যিনি সাধারণত বাইরে যান না তিনি কেন আমার ঘরে এলেন এবং আমিইবা কী করব—ভেবে পাচ্ছিলাম না। পীর সাহেব একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বাবা, কী কী অস্ত্রশস্ত্র এনেছেন, দেখি?" আমি বিস্ময় কোথায় রাখব! দুই কোঠার ঘরের এক ঘরে আমি থাকি, আরেক ঘরে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে এইচই-৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড থেকে শুরু করে এনারগা-৯৪, রাইফেল, এসএমজি, এসএমসি, এলএমজি, বিস্ফোরক, এন্টি-পারসোনাল মাইন, এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন, গোলাবারুদ, ২ ইঞ্চি মর্টার সব দেখিয়ে ও বুঝিয়ে বললাম। বোঝানোর মাঝে মাঝে পীর সাহেব আবার কোনটা দিয়ে কী হয়, তাও জানতে চাইলেন। প্রশিক্ষণের সময় যেভাবে অস্ত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেয়া হয়, সেভাবেই পীর সাহেবকে সব বলে গেলাম। তিনি কি সবই বুঝলেন? এত ধৈর্য ধরে শুনলেন যে! পীর সাহেব এবার আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বাবা, তৈরি হয়ে যান, যুদ্ধ করতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে।" আমি কিছুই মেলাতে পারছিলাম না। অথচ যখন কাশিমপুর এসেছিলাম কত লোক বলেছিল পীর সাহেবের বাড়িতে আর্মি আসে, তারা খুব মান্য করে পীর সাহেবকে। আমি যেন আমার বার্তা পেয়ে গেলাম।

ভূমিকম্পে গাছ থেকে কলা পড়বে—এই আশায় ওপর দিকে হাঁ করে গাছের নিচে বসে থাকার মতো কি আমাদের প্রতিরক্ষার পাকিস্তানিদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি ও অপেক্ষা দুই-ই করতে লাগলাম। তবে জানতাম ওরা আসবেই, শুধু সময়ের ব্যাপার। পাকিস্তানি শত্রুরা মুক্তিবাহিনীর নাম শুনলে যেখানে যাওয়ার নয় সেখানেই যাবে। যুক্তিতর্ক পরের কথা। আর পরের কথাই যদি না হবে তাহলে হাঁটু সমান কাদা পানি দিয়ে কি কেউ চাপিতলায় এসে এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে? কী এমন রণকৌশলগত গুরুত্ব আছে এ গ্রামের? প্রশিক্ষণ পুস্তিকার রণকৌশল পাকিস্তানিরা কোন অনুপ্রেরণায় বদলে ফেলেছিল, এখন বুঝি।

আমাদের প্রতিরক্ষার ক'টা উল্লেখযোগ্য দিক জানানো দরকার, সুষ্ঠু বিচারের সুবিধা হবে। প্রতিরক্ষার রণকৌশলগত দিক ও বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্য এখানকার বিচারে বিশ্লেষিত।

AMARBOI.COM

ক. প্রতিরক্ষাটি ছিল এক সারির প্রতিরক্ষা (Linear Defence)। কোনো গভীরতা (Depth) বা পেছনে কোনো সেনাদল না রেখেই প্রতিরক্ষা অবস্থান নেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল একটা মারাত্মক ভুল।

খ. প্রতিরক্ষাটি ছিল অত্যন্ত আড়ষ্ট প্রতিরক্ষা (Compact Defence)। এত ছোট পরিসরে কোনো বিবেচনাতেই এত লোকবলের প্রতিরক্ষা নেয়া যায় না।

গ. স্বভাবতই বেতার বা ফিল্ড টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে প্রতিরক্ষার ওপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

ঘ. শত্রুর আগমন সম্বন্ধে সংবাদ দেবার জন্য পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Early Warning System) শুধু অপ্রতুলই ছিল না, অনির্ভরশীলও ছিল।

ঙ. পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে এক পর্যায়ে আমাদের পশ্চাদপসরণ করার পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও তার জন্য কোনো কার্যকর ও সুষ্ঠু আদেশ দেওয়া হয়নি।

চ. কাজের বিবেচনা এবং তদানুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করা হয়নি।

ছ. মূল প্রতিরক্ষার একটি বিকল্প প্রতিরক্ষার অবস্থান মাইল খানেক পেছনে তৈরি ক'রে রাখা হয়েছিল এবং কোন প্লাটুন কোথায় অবস্থান নেবে তাও মোটামুটি বলা হয়েছিল। গোটা প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় এটাই ছিল সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।

জ. চাপিতলায় আরশী নদীর ওপর সেতুটি অকেজো করায় শত্রুকে কাঙ্ক্ষিত পথে আনতে পারা গিয়েছিল।

এ প্রতিরক্ষার পুঁথিগত ময়নাতদন্ত করতে গেলে প্রতিরক্ষা নামের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। ৭ নভেম্বর পড়ন্ত বেলায় একটি ছেলে দৌড়ে এসে আমাকে খবর দিল যে, পশ্চিম দিক থেকে শত্রু আক্রমণ রচনা করছে। আমি তখন প্রতিরক্ষার পূর্বদিকের অবস্থানে। মাথাটা হঠাৎ ঝিম করে উঠল। শেষ পর্যন্ত কি সক্রেটিসের মতো হেমলক পান করতে হবে? দৌড়ে গেলাম প্রতিরক্ষা অবস্থানের মাঝামাঝি, রাস্তার উপর। শত্রুদের এফইউপি[১] ছেড়ে এসল্ট ফরমেশনে প্রচণ্ড ফায়ার করতে করতে এগিয়ে আসতে দেখলাম। রাস্তার দক্ষিণে ছিল মাত্র দুটো প্লাটুন, রমিজের প্লাটুন সর্ব পশ্চিমে। হাঁটু সমান কাদা পানি দিয়ে শত্রু আসছে, কিন্তু কেউই ফায়ার করছে না। চিৎকার করে বার বার বলতে লাগলাম ফায়ার করতে, কেউ শুনল না। কণ্ঠস্বরের দূরত্বে গিয়ে এতবার রমিজকে এলএমজি দুটি

১. এফইউপি বা বিন্যাসভূমি : এই স্থানে আক্রমণকারী সৈন্য সৈনিক আক্রমণের উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়। এফইউপি অবশ্যই শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে অবস্থিত হতে হয় এবং শত্রুর ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ার থেকে নিরাপদ থাকতে হয়। এফইউপি থেকে আক্রমণ রেখায় যাওয়ার পথ অবশ্যই সহজ ও নিকটে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

AMARBOI.COM

দিয়ে ফায়ার করতে বললাম; কিন্তু কিছুই হলো না। কী সিদ্ধান্ত নেব তখন? অন্ধকার হয়ে আসছে বেলা, অন্ধকার হয়ে আসছিল আমাদের বর্তমান। আদেশ দিলাম কালক্ষেপণ না ক'রে সবাইকে পশ্চাদপসরণ করে বিকল্প প্রতিরক্ষা এলাকায় অবস্থান নিতে। শত্রুকে ওয়াক ওভার দিতে বাধ্য হলাম।

রমিজ কেন ফায়ার করল না? নির্বুদ্ধিতা, না উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নাশকতা। ক'দিন আগে পাকিস্তানি ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের যে বাঙালি সৈনিক নায়েক জাফর ইকবালকে এলাকার ও আমাদের প্রতিরক্ষার অবস্থানের আইস্কেচসহ বন্দি করেছিলাম, রমিজ কি তেমনি একজন ব্যক্তি? আমাদের সাথে দেশে আসার জন্য রমিজের এত কাকুতি মিনতি কি এজন্যই ছিল? অন্যান্যরা রমিজের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার অনুরোধ করলেও আমি কিছুই করিনি। কিছুই করা সমীচীন ছিল না কেননা তাতে অন্যান্য যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেবল দুজন এনসিওকে বললাম তাকে চোখে চোখে রাখতে আর বিকল্প প্রতিরক্ষা অবস্থানে তার প্লাটুনকে পেছনের ডান দিকে অবস্থান নিতে দিলাম। রমিজের প্লাটুনের ছেলেরা ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে অভিযোগ করতে চেয়েছিল যে, রমিজ তাদের ফায়ার করতে দেয়নি কিন্তু আমি তাদের তা বলবার সুযোগ দিলাম না।

যাদের মধ্যে এখন শত্রু শত্রু খেলা শুরু হবার কথা তারা এখন ৭/৮শ গজের ব্যবধানে মুখোমুখি প্রতিরক্ষা অবস্থানে। আমাদের বিকল্প প্রতিরক্ষা অবস্থানটি অন্তত প্রতিরক্ষার ন্যূনতম শর্তগুলো পূরণ করে। ৪০০ গজ সামনে দৌলতপুর মাদ্রাসায় পাঠিয়েছিলাম একটি এলএমজিসহ (এই বিশেষ ভারতীয় অস্ত্রটি একটু বেঢপ ধরনের। ৩০ রাউন্ডের ম্যাগজিন এতে ভরা যাবে, কিন্তু ব্যারেল বদল করা যাবে না। ক' ম্যাগজিন ফায়ার করলে ব্যারেল গনগনে লাল হয়ে গ'লে পড়ার দশা) ৭ জনের একটি দলকে।

এদের সামনে পাঠিয়েছিলাম যেন শত্রু আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক আঁচ করতে না পারে। নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থান মাস্ক করবার উদ্দেশ্যে পাঠালেও রণকৌশলগত সঙ্গানুযায়ী 'মাস্ক পজিশন'[১]-এর সাথে এর তেমন কোনো বাস্তব ও বৈশিষ্ট্যগত মিল ছিল না। নইলে শত্রুর আক্রমণের মুখে এই ছেলেদের মাদ্রাসা থেকে পেছনে নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থানে আনতে পারছিলাম না কেন? তাদের পশ্চাদপসরণের নিরাপদ কোনো পথের আদতে কোনো বিবেচনাই করা হয়নি।

চাপিতলা প্রতিরক্ষা থেকে বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসারণ করলাম, তখন অন্ধকার নেমে আসছে। নিয়ন্ত্রণহীন পশ্চাদপসারণের মতো উচ্ছৃঙ্খল আর

১. মাস্ক পজিশন বা মুখোশ অবস্থান : মূল প্রতিরক্ষার সম্মুখে এবং শত্রুর সম্ভাব্য আগমন পথে প্রতিরক্ষার কিছু প্রধান অস্ত্র দ্বারা গঠিত একটি দল প্রতিরক্ষার সামনে অবস্থান গ্রহণ করে। শত্রুর আগমনের সময় এই অবস্থান থেকে তাদের ওপর ফায়ার করে মূল প্রতিরক্ষার অবস্থান ও প্রতিরক্ষার অস্ত্র সম্বন্ধে শত্রুকে বিভ্রান্ত করা হয়। শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির সাধন মাস্ক পজিশনের মূল লক্ষ নয়। মাস্ক পজিশন এই উদ্দেশ্য সাধনের পর পশ্চাদপসারণ করে মূল প্রতিরক্ষায় পূর্ব নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নেয়।

AMARBOI.COM

আত্মঘাতী কাজ যুদ্ধে আর কিছুই হতে পারে না। পি-৮০ স্মোক গ্রেনেড ফাটিয়ে গোটা গ্রামটাকে একটা ধূম্রকুণ্ডলীতে পরিণত করলাম। আমাদের পশ্চাদপসারণকে শত্রুর দৃষ্টির বাইরে রেখে নিরাপত্তা বিধানের জন্য এটা ছাড়া সে সময় আর কোনো বিকল্প ছিল না। এমন সময় অহেদ কেরানি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো আমার কাছে। একরকম অধিকারের সুরে আমাকে সে অনুরোধ করল তাকে একটা রাইফেল আর ৫০টি গুলি দিতে; সে যুদ্ধ করবে। আমার মাথায় রক্ত আগে থেকেই উঠে ছিল। হাতের এসএমজি'র বাট দিয়ে তাকে মারতে গিয়েও কেন যেন মারলাম না। রাগে ফুললাম কিন্তু ফাটলাম না। হোক না মুক্তিযুদ্ধ, তবুও একটা অস্ত্র কীভাবে তাকে দেয়া যায়? কার রাইফেল আর কোথা থেকে গুলি আমি তাকে দেব? কী মনে করেছে সে? প্রচণ্ড রাগ চেপে হজম করা প্রচণ্ড কষ্ট। ক' সেকেন্ডের ঘটনা আমাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে ফেলল। এই ক্রোধের কোনো বহিঃপ্রকাশ অবশ্য কোথাও ঘটতে দিলাম না।

আমাদের বিকল্প প্রতিরক্ষা অবস্থানটি দক্ষিণ বাঙ্গোরা, খামারগাঁও ও খাঁপুরা গ্রামের অংশ জুড়ে। রাতের অন্ধকারে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণের ফলে শত্রু আমাদের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে কোনো আঁচ করতে পারছিল না। জ্যোৎস্না উঠল পরে। হারানোর মতো সময় নেই আমাদের, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছুই ঘটে যেতে পারে। আমি স্থির করলাম শত্রুর সম্ভাব্য আগমন পথেই মাইন দ্বারা বুবি ট্র্যাপ[২] লাগাব।

গনির কথা বোধ হয় আগে বলা হয়নি। আজো বেঁচে আছে হয়তো; হয়তোবা নেই। লেখাপড়া দূরে থাক, কারুর বইপত্র কোনোদিন বহন করার সুযোগ বোধকরি হয়নি তার। সারা গা ভর্তি দাদ। গড়ন অস্বাভাবিক রকম শক্ত এবং বেঁটে। কোন মহাজনের বাড়িতে যেন বছরকাবারি কাজ করে। মহাজনের নাম এমন বিশ্বাসের সাথে আমাকে বলল যেন আমি অবশ্যই তাকে চিনে থাকব। পরিবার শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে সে আমাদের কাছে এসেছে যুদ্ধ করবে ব'লে। আপাতত একটা রাইফেল চাই। আমি তাকে বললাম, যুদ্ধ তো কেবল শুরু, চলবে বহু বছর। আমাদের সাথে থাকো, কাজ-টাজ করো, নৌকা বাও আমাদের; রাইফেল পাবে। এই লোকটির চিত্তে যে এত ইস্পাত ছিল, তা আমার কল্পনায়ও ছিল না। এই গনি মিয়াদের সংখ্যা এদেশে স্বাধীনতবিরোধীদের চেয়ে এখনো বেশি আছে বলেই আমরা আজো মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছি। এরা আছে বলেই কালো মেঘের পেছনে সূর্যরেখা দেখা যায়; এই আমি আপনি আছি বলেই শুধু নয়। ছোট কাজের জন্য যারা নিজেদের বেশি বড় মনে করে তাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, বড় কাজের জন্য তারা অত্যন্ত ছোট।

২. বুবি ট্র্যাপ : এমনভাবে লাগানো মাইন বা বিস্ফোরক যা আপাত দৃষ্টিতে মাইন বা বিস্ফোরক হিসেবে প্রতীয়মান হয় না, কিন্তু যখনই এটাতে ক্ষেত্র বিশেষ টান, চাপ অথবা ঢিল দেওয়া হয় তখনই তা বিস্ফোরিত হয়।

AMARBOI.COM

এ সুযোগে চৌদ্দ বছরের বাচ্চুর কথাও দু'লাইন লিখি। বাবা-মা হারা, পিতামহও গত বাচ্চুর। বুড়ি দাদীর ভিক্ষার অন্নে সে লালিত। সেবাদাসরা একে ঘুম থেকে তুলে তাদের প্রভূতের কাছে নিয়ে রাজকারে ভর্তি করে দিয়ে আসে। বাচ্চু একদিন নিজের রাইফেল আর ৫ রাউন্ড গুলি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হবে ব'লে আমাদের কাছে চলে আসে। ১৯৭৬ সালে অক্ষরজ্ঞানহীন এই ছেলেটিকে একে-ওকে অনুরোধ করে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে (আমার ইউনিট) ভর্তি করে দিয়েছিলাম সুইপার হিসেবে। পরে শুনেছি বাচ্চু চাকরিচ্যুত হয়েছে। ভলো যুদ্ধ করতে পারাটাই যে ভালো সুইপার হবার পূর্বযোগ্যতা নয়, বাচ্চুকে বুঝিয়েছি। কিন্তু ছেলেটা বোধহয় কিছুই বোঝে না।

মাইন লাগানোর আর বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রচলিত ও অপ্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন হায়দার ধৈর্য ধ'রে ক'দিন আমাকে শিখিয়েছিলেন। আর বাকিটা অভিজ্ঞতা। বিপদ হলো যখন মাইন লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন কাছাকাছি এমন কোনো ছেলে ছিল না যে মাইন লাগাতে পারে। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে গনি এসে হাজির। সে যুদ্ধ করবে। তার বিনীত অনুরোধ, যুদ্ধতো শুরু হয়েছে কাজেই এখন তার একটা রাইফেল চাই। আমি গনিকে বললাম যে, গুলি করে আর ক'জনই বা মারা যায়, মাইনগুলো দেখিয়ে বললাম, দেখো এগুলো দিয়ে কী হয়। কী করে এম-১৪ এন্টি-পারসোনাল মাইনে ফিউজ লাগাতে হয়, ট্রিপ ওয়ার[১] কী করে ফিউজের সাথে লাগিয়ে বুবি ট্র্যাপ বানাতে হয় মিনিট দশেকে গনিকে শিখিয়ে দিলাম। নির্দেশ মতো গনি কোম্পানীগঞ্জ-নবীনগর সড়কের চাপিতলা-বড়বাঙ্গোরা অংশের রাস্তার এক পার্শ্বে মাইন লাগিয়ে ট্রিপ ওয়্যার আরেক পার্শ্বে খুঁটি পুতে তাতে বাঁধল। ট্রিপ ওয়্যারে একটু টান পড়লেই মাইন উড়ে যাবে। মাইন শত্রু-মিত্র চেনে না। কে বিশ্বাস করবে ভোর নাগাদ এই চাঁদনি রাতে গনি ১৮টি এম-১৪ মাইন দিয়ে বুবি ট্র্যাপ লাগিয়েছিল। আমিও বিশ্বাস করতাম না যদি না স্বচক্ষে দেখতাম। পরদিন ছিল শত্রুর এবং আমাদের শেষ সময়ের কাজটুকু সেরে নেবার দিন। রোজার মাস। আমরা অনেকেই রোজা ছিলাম। প্রতিরক্ষার সবার ওপর আদেশ দেয়া আছে নির্দেশের আগে কেউ ফায়ার না করবার। গুলি নিয়ন্ত্রণ ও নিজ অবস্থান গোপন রাখার জন্য এটি অপরিহার্য। বিকাল পাঁচটার দিকে প্রতিরক্ষার পেছন দিয়ে আমি ৩জন এনসিওকে নিয়ে (হাবিলদার কুদ্দুস, হাবিলদার গাজি ও নায়েক নূরুল হক) ডানদিকের প্রতিরক্ষার অবস্থানে যাচ্ছি। ঠিক তখন আমাদের থেকে অবস্থান থেকে শত্রুর ওপর এলএমজি'র ফায়ারের শব্দ পেলাম। শত্রু এটাই চাচ্ছিল। নির্দেশ

১. ট্রিপ ওয়্যার : এটি এমন একটি সূক্ষ্ম তার যা কোনও মাইন বা বিস্ফোরকের সাথে ফিউজের মাধ্যমে এমনভাবে লাগানো হয় যাতে এতে ক্ষেত্রবিশেষে টান, চাপ বা ঢিল দেওয়া হলে সংযুক্ত মাইন বা বিস্ফোরক বিস্ফোরিত হয়। বৈশিষ্ট্যগতভাবে এই তার অত্যন্ত শক্ত এবং সাধারণত রণাঞ্চলের রঙ-এর সাথে এমনভাবে মিলে থাকে যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।

AMARBOI.COM

উপেক্ষা করে ভীতসন্ত্রস্ত ছেলেরা ফায়ার শুরু করে দিল। আমাদের অবস্থান আর গোপন রইল না। শত্রু ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে আমাদের অবস্থানগুলোর ওপর অনবরত ফায়ার শুরু করল। সেই ফায়ারে টিনের ঘরগুলো উড়ে গিয়ে দুমড়ে মুচড়ে পড়ছিল। আমি গুলির মুখে আমার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আসতে পারছিলাম না। এর মাঝে কিছু অংশ সাঁতরাতেও হলো। আবাদি জমির ওপর পানি ভেঙে এসে তারপর সাঁতারানো। আমার স্থূলকায় দেহের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। রাস্তায় উঠে পথের ওপর প'ড়ে গেলাম। এবারো যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ প্রায় হারাতে বসেছিলাম। এখানে শুধু আমার প্রাণ নয়, বহু ছেলের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত। আছে বাঙালির সম্মানের প্রশ্ন। অসাড় দেহকে অবজ্ঞা করে একমাত্র মনের জোরে বেহাল নৌকার হাল ধরলাম। শেষ অবধি শেষ রক্ষা হলো।

ছেলেটার নামটা মনে আসছে না। দুই হেভারস্যাকে আড়াআড়ি করে কাঁধে ঝুলিয়ে ৮টি ক'রে ১৬টি ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা আর হাতে মর্টার নিয়ে দৌড়ে এলো আমার কাছে। তার বক্তব্য যে তার গোলা শত্রুর অবস্থানের ওপর পড়ছে না কেবল দূরত্বের কারণে। তার ইচ্ছা সে তিন চার'শ গজ এগিয়ে গিয়ে ধানক্ষেতে বসে ফায়ার করলে গোলা শত্রুর অবস্থানের ওপর পড়বে। ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলায় যে কেউ মারা যায় না, চাঁদনি রাতে ধানক্ষেত থেকে একলা অবস্থান নিয়ে ফায়ার করলে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে যাবে, এসব কোনো যুক্তি সে শুনতেই নারাজ। সে বলল, "স্যার দোয়া করেন, ইনশাল্লাহ্ মরাম না।" আমি অনুমতি দিলাম, দোয়াও করলাম। সে মরেনি। একে কী বলা যায়, বুকভরা সাহস না বদ্ধ বোকামি। অনেকেই বলেন বোকা না হলে নাকি যুদ্ধে সাহসী হওয়া যায় না। আমি বলি সম্মুখ সমরে এ বোকা সাহসই নিরেট দেশপ্রেম। রাত চারটার দিকে শত্রু আমাদের প্রতিরক্ষার ঠিক সামনে থেকে আক্রমণ করল। গোলাগুলি অবশ্য সেই মাঝরাত থেকেই চলছে। দুপক্ষই খুব মনোযোগের সাথে কাদের লক্ষ্য করে ফায়ার করছিল জানি না। শত্রু এফইউপি ছেড়ে শ'দুয়েক গজ এসেছিল। তারপর সবাই আমাদের কার্যকরী ফায়ারে টিকতে না পেরে আক্রমণ থামিয়ে ধানক্ষেতে অবস্থান নিল। এ আক্রমণেরও সেখানে ইতি। এদিকে মজার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষার। বহু ছেলে যারা মর্টার বা আর্টিলারি শেলিং দেখেনি তারা লক্ষ্যহীনভাবে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। কেউ ট্রেঞ্চ থেকে উঠে দৌড় শুরু করল, কেউ বা লাফিয়ে পড়ল ট্রেঞ্চে। একেই বলে শেল শক্ (Shell Shock)। এদের অনেকেরই বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই বা ব্যাটেল ইন্যুকুলেশন[১] হয়নি। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ফলাফলের জন্য পাকিস্তানিরা এখানে এসেছে জানতাম। তাই জানতাম যে, শত্রুর চূড়ান্ত আক্রমণ কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার। চূড়ান্ত আক্রমণ এলো প্রতিরক্ষার ডান দিক

AMARBOI.COM

১. ব্যাটেল ইন্যুকুলেশন : প্রকৃত যুদ্ধের সাথে পরিচিতির উদ্দেশ্যে সৈনিকের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তাজা গোলাগুলি, মর্টার, আর্টিলারি ও ট্যাঙ্ক ব্যবহারের মাধ্যমে যুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশন অনুশীলন করানো হয়। যুদ্ধভীতি দূরীকরণ ব্যাটেল ইন্যুকুলেশনের প্রধান লক্ষ।

থেকে পরদিন বেলা নয়টার দিকে। সব সময় সব কাজ হয় না। তাই নয়টার আক্রমণ বারোটার পরে গিয়ে ফল দিল। শত্রুর এ তিন ঘণ্টার বৃত্তান্ত শুনতে হলে পাকিস্তান গিয়ে তাদের দু'একজনকে খুঁজে বের করে জানতে হবে। দু'দিন আমরা কেউই কিছু খাইনি। গ্রামের মানুষ গরু জবাই করেছে, খিচুড়ি রান্না করেছে—খবর পেয়েছি, কিন্তু কেউই কিছু আনলো না। গণ্ডগোলের মধ্যে কে যায়? তবে কি যারা রান্না করল তারা সবাই মিলেই খেল? এর মধ্যে আমাদের বেশ কিছু ছেলে আহত হলেও কেউ মারা যায়নি। আমাদের কাছে বেশিরভাগ অস্ত্রই ভারতীয় ৭.৬২ মিঃ মিঃ বোল্ট এ্যাকশন রাইফেল। রাইফেল ফায়ার করে গত দু'দিনে এক এক ছেলের হাতে ফোসকা ফেটে দগদগে হয়ে গেছে। সাড়ে এগারোটার দিকে পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলাম। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো দু'দিন দু'রাত পাঞ্জা লড়ে না-জেতা না-হারার ফলাফলের মতো ফলাফল লাভ করা হয়তো যেতো। তার কোনো প্রয়োজন দেখলাম না। সবাই আমরা মালাই বাঙ্গোরা পার হয়ে চলে এলাম। যারা রমিজের প্লাটুনকে দেখে এলো তারা জানাল, রজিমের প্লাটুন পশ্চাদপসরণ করছে না। আমি লোক মারফত খবর পাঠালাম রমিজকে। রমিজ বলে পাঠাল যে, সে পশ্চাদপসরণ করবে না; সম্ভব হলে যেন আমি কিছু গুলি পাঠিয়ে দিই। আমি শুনে চমকে উঠলাম। সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। রমিজ কী চাইছে? রমিজ কি আমাকে এমন কোনো বার্তা পাঠাতে চাচ্ছে, যে বার্তা সে ভাবছে আমি বুঝছি না। দশ, পনেরো, বিশ রাউন্ড মাত্র গুলি অবশিষ্ট প্রত্যেকের কাছে। তাছাড়া যুদ্ধের সময় কে কাকে গুলি দিয়ে হাতিয়ারকে লাঠি বানাবে, তবুও রিজার্ভ এম্যুনিশন থেকে প্রায় ৪০০ রাউন্ড এম্যুনিশন পাঠিয়ে দিলাম রমিজের কাছে। বলে পাঠালাম, আমার শেষ অনুরোধ রমিজের কাছে, যেন এক্ষুণি পশ্চাদপসরণ করে। তার ডানে বামে আমাদের আর কোনো অবস্থান নেই। তার প্লাটুন একাই মাত্র অবস্থানে। বিকালে শত্রুর কমান্ডিং অফিসার সদলবলে পীরকাশিপুরে এসে পীর সাহেবকে দুটো খাসি নজরনা দিয়ে যায়। পরদিন আমি গেলে পীর সাহেব আমাকে বললেন যে, পাকিস্তানি কমান্ডিং অফিসার তাকে বলেছে যে, তাদের দুজন অফিসার আর পঞ্চান্ন জন সৈনিক মারা গেছে। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরতে গিয়ে বহু পাকিস্তানি সৈন্যের মৃতদেহ ধানক্ষেতে, আর এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এরই মাঝে বেশ কিছু রাজাকারের মৃতদেহও ছিল। এরা কেন প্রাণ দিল বুঝলাম না।

অভিমানের ভাষা থাকে। কাদম্বিনী যা বলতে চেয়েছিল তা বলে যেতে না পারলেও সংশয়হীনভাবে সব বুঝিয়ে গেছে। আমাদের রমিজও সব বুঝিয়ে গেল। বলে গেল, সে বোকা হতে পারে কিন্তু দেশদ্রোহী নয়। দেশকে সে কত ভালোবাসতো; সারা শরীরে প্রায় ৩৬টি গুলি নিয়ে আমাদের তা বুঝিয়ে গেল।

অহেদ কেরানির কী হলো কে জানে। পুরোনো দো'নলা বন্দুকটি দিয়ে সে যুদ্ধ করবার মনস্থির করে ফেলল। জীবনের কিছু সুপ্ত বৈশিষ্ট্য থাকে যেগুলোর বহিঃপ্রকাশ কেবলমাত্র প্রয়োজনেই ঘটে। অহেদ কেরানির ক্ষণিকের সৈনিক সাজা

AMARBOI.COM

যেমনটি। ১৪ বছরের বাচ্চু আর ৭২ বছরের অহেদ কেরানি কোন অনুপ্রেরণায় অমন মরিয়া হয়ে উঠল? গনিইবা একটা রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ মরণ খেলায় মাততে চাইল কেন? অহেদ কেরানি শুনেছি বন্দুক দিয়ে গুলি করে ৬ জন শত্রুকে হত্যা করার পর শত্রু তার বাড়ির আরো ৪জনসহ অহেদ কেরানিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭১ সালে ৭ নভেম্বর রবিবার পাকিস্তানিরা অহেদ কেরানিকে ছাড়াও চাপিতলায় আরো ৩২ জনকে হত্যা করে। যুদ্ধে শহীদ হলো আমাদের ইপিআর-এর হাবিলদার রমিজ, এমওডিসি'র[১] সিপাই মোঃ বাচ্চু মিয়া ও মোঃ আবুল বাশার।

দেশ স্বাধীন হলো। যারা ছিল, যারা নেই তাদের জন্য মন খারাপ লাগতে লাগল। ইচ্ছা হলো অহেদ কেরাদিকে আমাদের প্রজন্মের কাছে রেখে যেতে। বাহাত্তর তো যুদ্ধের যাবার বয়স নয়। দো'নলা বন্দুকও তো আজকের যুদ্ধাস্ত্র নয়। কোন অনুপ্রেরণা একলা এক ব্যাটালিয়ান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে? এ কোন দেশপ্রেম? এ কেমন আত্মাহুতি? কোন বিশেষণ দ্বারা এর সংজ্ঞা লেখা যাবে? করণীয় কাজ যদি কোনোদিন কেউ না করে, তাহলে কোথাও পৌঁছানো যাবে না। ইতিহাসের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যই এ বীরগাথা রেখে যাওয়া দরকার, বর্তমান বসে থাকে না। দীনতার কারণে তা করতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎ কালিমাময় হয়ে যাবে। বাহাত্তরের জানুয়ারি মাসে আমার সেক্টর কমান্ডার মেজর হায়দারকে বললাম অহেদ কেরানির বীরত্ব, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগকে বীরত্ব উপাধি দ্বারা স্বীকৃত করতে। তাকে অনুরোধ করলাম, অহেদ কেরানির সাহসিকতা ও আত্মাহুতির কাহিনী (Citation) অলংকৃত ভাষায় লিখতে, যেন সে বীরত্ব উপাধি পায়। সেক্টর কমান্ডারের দীর্ঘ নিঃশ্বাস আমার কান এড়ালো না। তিনি আমার পিঠে হাত রেখে ইংরেজিতে বললেন, "খোকা, সে চাবি আর আমাদের হাতে নেই।"

আমি হিম হয়ে গেলাম জবাব শুনে। সেই যে চাবি হারালাম, সে চাবি আজো খুঁজে ফিরছি। অভাগা না হলে কি কেউ ঘরের চাবি বেহাত করে?

AMARBOI.COM

১. এমওডিসি : (Ministry of Defence Constabulary) : সাধারণত স্থাপনা, বিমান ও নৌ বাহিনীর স্থায়ী প্রতিষ্ঠান , দপ্তর বা অন্যান্য আপেক্ষিক কম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানসমূহের নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনী।

২নং সেক্টরের 'পরিস্থিতি প্রতিবেদন' (Situation Report)-এর উদ্ধৃতাংশ :

SECRET

IMMEDIATE
HQ No. 2 Sector
Bangladesh Forces
DF/400/40/G
26 Nov. 71

To : Control Room
(D Sector)

Info : Ech HQ BDF
HQ 'K' Force

Subj : **SITUATION REPORT**

1. **Operation in Comilla District**

a. On 8 Nov. 71, MF of Muradnagar attacked a group of Pak Forces at Chapitala under PS Muradnagar. As a result 56 Pak soldiers including two officers were killed in that operation. Three of our own troops attained 'SHAHADAT' during the operation, named Hav Ramizuddin, Sep Bacchu Miah and FF Abul Basher. After sometime after the engagement aggressors being reinforced came to the spot and killed 50 innocent villagers.

b. On 9 Nov. 71 at Bangora under PS Muradnagar MF attacked the soldiers when they were advancing towards village Bangora. Firing continued for sometime from both the sides. In the operation 6 enemy soldiers were killed and many of them were injured. Enemy used 3" Mortars for which 40 cultivators of that locality lost their lives. Own casuallity was nil.

2. **Operation in Dacca District**

a. ...

AMARBOI.COM

Signed
Major
Comd
(ATM Hyder)

SECRET

উদ্ধৃতাংশ
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দলিল পত্র : একাদশ খণ্ড
সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, জুন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-১৫৯

BANGLADESH FORECS HQ. MUJIBANAGAR
WAR BULLETIN
NOV. 16, 1971

DACCA, COMILLA, CHTTAGONG SECTOR

... On Nov. 9. Mukti Bahini engaged with Pakistani troops approximately 600 in strenght moving in CHAPITALA area. The fight continued for 5 hours in which the enemy suffered heavy casualties ...

ধূসর পাণ্ডুলিপি

রেলপথে আখাউড়া থেকে সিলেট যেতে আজমপুর, রূপার পরই মুকুন্দপুর স্টেশন। একাত্তরের মে মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানি পশুরা বীরত্বের সঙ্গে মুকুন্দপুর বিনাযুদ্ধে দখল করল নিরীহ ও নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের হত্যা আর নির্যাতন ক'রে। বীরত্ব প্রদর্শন ছাড়াও এদের আরো কিছু কাজ ছিল—এই গুরুত্বপূর্ণ রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা মুক্তিবাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ রাখা, এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ রোধ করা। এই নির্বোধ পশুগুলো তখন কল্পনায়ও আনতে পারেনি যে এদের অস্তিত্ব গুঁড়িয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে রফিক, তাজুল, মোজাম্মেল, এলু ও মোতালেবরা। এই পশুরা ভাবতেও পারেনি এ ছেলেরা তাদের জন্য এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যে, নিজেদের নাম জিজ্ঞাসা করলে এরা এদের বাবার নাম বলবে।

ঊনসত্তরের জানুয়ারি। স্বাধিকার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সায়ীদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ইতিহাসের সম্মানের ছাত্র। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে সায়ীদ। বিত্ত, বৈভব আর খ্যাতি পেয়েছে বংশ পরম্পরায়। আমাদের দেশের ফর্সা লোকদের শ্বেতাঙ্গরা বলে 'ট্যান' (Tan)। সায়ীদকে 'ট্যান' বলতে গেলে এই শেতাঙ্গদেরও ক'বার ভাবতে হবে—গায়ের রঙ এমনই ফর্সা। ক'টা চোখ। দৈহিক উচ্চতায় এবং গড়নে সুদর্শন। এ ধরনের ছেলেদের সাধারণত রাজনীতি করার আগ্রহ বা প্রয়োজন কোনোটাই থাকে না। অথচ এই সায়ীদকেই দেখা গেল মিছিলের পুরোভাগে। একা নয়, সঙ্গে বন্ধু তারেক আর রফিক। ঊনসত্তরের ২১ জানুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালো। লুটিয়ে পড়ল আসাদ, রাজপথ রঞ্জিত হলো আরো অনেক ছাত্রের রক্তে। সায়ীদরা তাদের বার্তা পেতে শুরু করল। আন্দোলনের কেবলই শুরু। হয়তো শেষ হতে হবে স্বাধীনতায়। স্বাধীনতার কথা মনে করতে হলে সেদিনের সেইসব আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছাত্রদের স্মরণ করতে হবে পরম শ্রদ্ধায়। একাত্তরের মার্চে যখন সায়ীদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল, তখন রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়া হলো। সায়ীদ বিলোনিয়া হয়ে ভারতে পালিয়ে গেল মে মাসে। গোটা জাতির সিদ্ধান্ত নেবার সময় তখন। ৩০ জন সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করে সায়ীদ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করল ১৯ অক্টোবর। শ্রেষ্ঠ ক্যাডেট হিসেবে 'সোর্ড অফ অনার' দিলেন তাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

AMARBOI.COM

পোস্টিং হলো তার ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। সায়ীদকে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানির অধিনায়কত্বের সঙ্গে দেয়া হলো বামুটিয়া সাব-সেকটরের দায়িত্ব। এই কোম্পানিকে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর মইন দায়িত্ব দিলেন মুকুন্দপুর শত্রু অবস্থান দখল করার। সেজামুরার রফিক, সতরপুরের তাজুল, মোজাম্মেল, এলু, মোতালেবসহ আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে পেয়ে গেল সায়ীদ। এরা এলাকার ছেলে। পথ-ঘাট, ঝোপ-জঙ্গল, জংলা সব ভেদ করে এরা আঁধার রাতে চোখ বুজে চলতে পারে। এর মধ্যে তাজুল আরো এক ধাপ এগিয়ে। তার ব্যবসা মাথায় ক'রে মালামাল সীমান্তের এপার ওপার করা—চোরাকারবারি। একই কাজ মোতালেবেরও। রফিকের নেতৃত্বে এতদিন পর্যন্ত মুকুন্দপুরের শত্রুদের দিনে-দুপুরে আকাশে তারা দেখিয়ে ছেড়েছে এরা। সায়ীদ এসে মিশে গেল এদের দলে অথবা এরাই মিলে গেল সায়ীদের সঙ্গে। সায়ীদের সঙ্গে কমিশন লাভ করা সেকেন্ডে লে. মনসুরুল ইসলাম মজুমদারেরও পোস্টিং একই কোম্পানিতে। চূড়ান্ত আঘাতের পরিকল্পনা-প্রস্তুতি চলছে। সুবাদার মান্নাফকে গোপন পরিচয়ে পাকিস্তানি আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা সংস্থা (ISI) ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে (BSF)। মান্নাফ সুবাদার হিসেবে BSF থেকে চলে এসেছে ১৯৬৯ সালে। মান্নাফ এই কোম্পানির একজন প্লাটুন কমান্ডার।

মুকুন্দপুর এবং পাশ্ববর্তী এলাকা একদিকে যেমন উঁচু-নিচু, তেমনি আছে জলাভূমি। ফাঁকে ফাঁকে সমতল এলাকায় আবাদি জমি, ঝোপঝাড়। শত্রুরা অবস্থান নিয়েছে উঁচু এলাকায়। পূর্ব দিকে আধা কিলোমিটার দূরেই ভারতীয় সীমান্ত। শত্রু তার প্রতিরক্ষা অবস্থানের সামনে লাগিয়েছে চোখা বাঁশের কঞ্চি (পাঞ্জি) এবং তার পেছনে লাগিয়েছে প্রচুর এন্টি-পারসোনাল মাইন। চারদিকে হালকা ও ভারি মেশিনগান বসিয়ে তৈরি করেছে সর্বমুখী প্রতিরক্ষা (All Round Defence)। তবে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো আকস্মিকতা অর্জনের এবং শত্রুর তাক লাগানো অস্ত্রের গুলি (Aimed Fire) এড়াবার জন্য শত্রুর পেছন দিক অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করার। তবে যত সহজে বলা হলো, কাজটি মোটেও তত সহজ ছিল না। নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ (Infiltrate) করে অবস্থান গ্রহণ ক'রে আক্রমণ রচনা করতে হবে। এর জন্য প্রচুর রেকি বা পর্যবেক্ষণ দরকার। কথায় বলে, রেকির সময় কখনো বৃথা যায় না। প্রায় প্রতিরাতেই সায়ীদ তার ছেলেদের নিয়ে শত্রুর অবস্থানে রেকি করতে যায়। এমনই এক রাতে রেকির সময় শত্রু অবস্থানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেল সায়ীদ, মজুমদার এবং তাদের দল। যে কোনো সময় শত্রুর গুলির সম্ভাবনা। সবাই মাটিতে অবস্থান নিল। তাজুল কথা বলে প্রচুর, কাজ করে তার চেয়েও বেশি। এমন সময় তাজুল ফিসফিসিয়ে বলল, 'স্যার, আমি যাইয়া দেইখ্যা আই।' ঝোপের মধ্য দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে মাথা উঁচু করে অভিজ্ঞ চোরাকারবারির মতো ঘন অন্ধকারে তাজুল চারদিকে কী দেখল কে জানে। ফিরে এসে বলল, 'কিছু নাই

AMARBOI.COM

স্যার। আমার লগে আইয়েন।' আরেক রাতে এমনই রেকি করার সময় তাজুল একেবারে শত্রুর ব্যাংকারের কাছে চলে গেল। আচমকা শত্রুর টর্চের আলো এসে পড়ল তাজুলের একেবারে মুখের উপর। শত্রুকে গুলি করার জন্য এক মুহূর্তকাল সময় না দিয়ে তাজুল এক লাফে ঝোপের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আগে চেঁচিয়ে শত্রুর উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'শালা আইতেছি, দেখামু মজা'। ভয় নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। এই তাজুল পশুগুলোর সঙ্গে যুদ্ধে মরবে না সে যেন জানতো।

৯ নভেম্বর ভারতীয় ১৮ রাজপুত-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল অশোক কল্যাণ ভার্মা এলেন সায়ীদের বামুটিয়া সাব-সেক্টরের সদর দফতরে। মুকুন্দপুর দখল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপ শেষে ভার্মা সায়ীদকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। সেদিন রাতে ভার্মার অনুরোধে সায়ীদ, ভার্মা এবং ১৮ রাজপুত-এর অন্যান্য অফিসারদের রেকি করতে নিয়ে গেল। এতদিনে সায়ীদের শত্রু অবস্থান সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। সবই দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়া হলো ভারতীয় অফিসারদের। এর পরপরই ১৮ রাজপুত রেজিমেন্টের মেজর শর্মা তার কোম্পানি নিয়ে অবস্থান নিলেন শত্রুর দক্ষিণে, মেজর আব্রাহামের কোম্পানি উত্তরে এবং ক্যাপ্টেন সুসুদিয়ার কোম্পানি উত্তর-পশ্চিমে। এ বিষয়ে সায়ীদ তার অধিনায়ক মেজর মইনের কাছ থেকে কোনো পূর্বসংবাদ পায়নি। মইন সায়ীদদের আক্রমণের সময় শুধু ব্যাটালিয়ান মর্টারের সাপোর্টের আশ্বাস দিয়েছিলেন। আক্রমণের ক্ষণ নির্ধারিত হলো ১৮ নভেম্বর আঁধারের পর; যাকে বলে Dusk Attack।

গোয়ালনগর গ্রামের 'নষ্টা' মেয়ে সায়রা হঠাৎ করেই আর নষ্টা রইল না। বাবা আজিজ চৌকিদার নামকরা রাজাকার। ঘরে সৎ মা। বাবা আজিজ চৌকিদার নিজেই মেয়ে সায়রাকে মুকুন্দপুর পাকিস্তানি ক্যাম্পে দিয়ে আসে। সায়রার বলার বা করার কিছুই ছিল না। সায়রার সঙ্গে 'মুতা' বিয়ের নাম করে রাত কাটায় পশুগুলো। এই সুযোগে সায়রা তার নষ্টামির নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার করল। শত্রুর অবস্থান ঘুরে ঘুরে শত্রুর বাংকারগুলোর অবস্থান, দুই ঠ্যাংঅলা অস্ত্র (হালকা মেশিনগান) তিন ঠ্যাংঅলা অস্ত্র (ভারি মেশিনগান) কোথায় বসানো এবং কোন দিক লক্ষ্য করে লাগানো একদিন লুকিয়ে এসে সায়ীদদের সব বলে দিল। সায়ীদ, মজুমদার, রফিক, তাজুল, মোজাম্মেল, এলু এবং মোতালেবরা তাদের আক্রমণ পরিকল্পনার শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলল।

১৮ নভেম্বর সূর্য ওঠার আগেই কোম্পানি নিয়ে সায়ীদ নির্ঝঞ্ঝাট অনুপ্রবেশ সম্পন্ন ক'রে আক্রমণের জন্য অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। লে. মনসুরের প্লাটুন দক্ষিণে, উত্তরে সুবাদার মান্নাফের প্লাটুন এবং মাঝে লে. সায়ীদ আরেকটি প্লাটুন নিয়ে। দুপুরের পর লে. কর্নেল ভার্মা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সায়ীদকে জানালেন যে, আক্রমণ রচনা করবে উত্তর দিকে থেকে মেজর আব্রাহামের কোম্পানি। অথচ আব্রাহামের কোম্পানি যেখানে অবস্থান নিয়েছে তার সামনের এলাকাটি উঁচুভূমি,

AMARBOI.COM

ফলে শত্রুর উপর কার্যকরী ফায়ার করা (Effective Fire) সম্ভব নয়। এ সংবাদে সায়ীদ, মজুমদার তাজুল, রফিকরা বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তাহলে কি তাদের পরিকল্পিত এবং প্রস্তুত করা যুদ্ধ করবে অন্যরা? তাহলে কি তাদের এতদিনের রেকি, শ্রম, খণ্ডযুদ্ধ সবই নিষ্ফল হবে? যুদ্ধে বিজয়ী হবার বা শহীদ হবার সমস্ত অহংকার মুহূর্তেই ম্লান হয়ে গেল। আক্রমণ যথাসময়ে শুরু হলো। আব্রাহামের কোম্পানি শত্রুর গুলির মুখে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুনঃঅবস্থান নিতে বাধ্য হলো। রাতের অন্ধকারে সায়ীদদের খাকি ইউনিফর্ম দেখে বোধকরি শত্রু ভেবে আব্রাহামের কোম্পানির সৈনিকরা তাদের ওপর ফায়ার করতে লাগল। আক্রমণ ব্যর্থ হলো। কাঙ্খিত সুযোগ এসে গেল আমাদের ছেলেদের। নিজ হাতে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসে গেল। শত্রু এরই মধ্যে কোম্পানির অবস্থানের ওপর গুলি করতে শুরু করেছে। সায়ীদ শত্রুর ওয়্যারলেসের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে। ওপরস্থ অফিসার উর্দুতে জিজ্ঞাসা করছে, 'কারা গুলি করছে? ভারতীয় বাহিনী না মুক্তিবাহিনী।' মুকুন্দপুর থেকে শত্রুরা জবাব দিচ্ছে, 'গুলির ওপর তো নাম লেখা নেই, কী করে বলব?' সায়ীদ কালক্ষেপণ না করে পরিকল্পিত আক্রমণ রচনা করল। তার আগে থেকেই শত্রু অবস্থানের ওপর ভারতীয় আর্টিলারির গোলা পড়ছে। শত্রু ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ২৮/২৯ জন যুদ্ধবন্দি ধরা হলো। শুরু হলো পলায়নপর শত্রু খোঁজা। তাজুলদের এক কথা, তারা যুদ্ধ না করে যুদ্ধ শেষ করবে না। EPCAF (ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স)-এর সিপাই কাইয়ুমকে পাওয়া গেল রেল লাইনের পূর্ব দিকে রাইফেল পিঠের তলে ফেলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার নাড়িভুঁড়ি অর্ধেক বেরিয়ে গেছে। তার তখন শুধুই মৃত্যুর অপেক্ষা। মুক্তিবাহিনী দেখে অনুনয় করতে লাগল উর্দুতে, 'দয়া করে আমাকে হত্যা করবেন না, আমি জয় বাংলার লোক।'

১৯৮০ সালে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে মেজর সায়ীদ শীতকালীন অনুশীলন এলাকা রেকি করতে আখাউড়া এলাকায় গিয়ে চম্পকনগর বাজারে খুঁজে পেল তাজুলকে, তার দুঃসময়ের সহযোদ্ধা। মুখে বসন্তের দাগের ওপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের চামড়া হাড়ের সঙ্গে প্রায় মিশে এসেছে। সায়ীদের জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, 'স্যার, বালা নাই।' 'শরীরের অবস্থা এমন কেন?' তাজুল জানাল, 'স্যার খাওন-দাওনের ঠিক নাই। হাফানিয়ে ধরছে।' সায়ীদের পকেটে থাকা একমাত্র ৫০ টাকার নোটটি তাজুলকে দিতে চাইলে তাজুল নিতে অস্বীকার করল। তাজুল কাঁদছে না, অথচ তার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। একে কী বলে? একি অভিমান? তাজুল মূর্খ। ও জানে না, যে দেশে আত্মসম্মানের মর্যাদা নেই সে দেশে অভিমান করা বোকামি। সায়ীদ ৫০ টাকার নোটটি তাজুলের পকেটে গুঁজে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। জিজ্ঞাসা করল তাজুলকে, 'করো কী এখন?' তাজুল চোখ মুছতে মুছতে অজান্তেই উত্তর দিল 'স্যার, ঐ আগের কাম।'

AMARBOI.COM

এলু মুকুন্দপুর রেলস্টেশনে চায়ের দোকানে লোকসান দিয়ে দোকানটিই বিক্রি করে দিয়েছে। গেরস্থালি করে এখন। বছরের খোরাক হয় না। মোতালেবের পুরানো ব্যবসা ভালো চলছে না বলে রাজনীতির ব্যবসা পরখ করায় ব্যস্ত। রফিক কোনোদিনও বড় হবে না জেনেও ব্যাংকে একটা ছোট চাকরি করে কোনোমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সায়রার নষ্ট হবার যৌবনও আজ হারিয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে কোথায় গেছে, কে জানে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে তাজুলের শরীরে ডান অংশ অবশ এখন। এদের কারুরই আর স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন নেই। মৃত্যুর পরোয়ানা আসছে না বলেই এঁরা বেঁচে আছে। এ বাঁচাকে জীবন বলে না। নিজেদের অর্জিত দেশে পরবাসী হয়ে আছে। অসভ্য দেশে যে এমনই নিয়ম। অথচ এঁরাই ছিল আমাদের মাঠের মুক্তিযুদ্ধের এক একটি স্ফুলিংগ। এরা ইতিহাসে নেই, বর্তমানে নেই আর অদূর ভবিষ্যতে যে থাকবে না, তাও আমরা প্রায় নিশ্চিত করেছি। এরা কেউ না, কিন্তু এরাই বাংলাদেশ।

তাজুলদের জন্য কেবল উজাড় করে দিয়ে যাবার জন্যই। এই অখ্যাত তাজুলরা যদি নাই-ই থাকবে, তবে আমরা বিখ্যাত হবো কীভাবে? তবুও বেঁচে থাক বাংলাদেশ।

তাগড়া

"War is an ugly thing, but not the ugliest of things; the decayed and degraded state of moral and patriotic feeling which thinks nothing is worth war is much worse.

A man who has nothing for which he willing to fight, nothing he cares about more than his personal safety, is a miserable creature who has no chance of being free, unless made and kept so by exertions of better man than himself."

— Art Cavagnaro, USMC (Retd)
(Prelude to War Heroes, Kent Delong)

তাগড়া যে 'তাগড়া', তা সে নিজেও জানে। বাবা-মার দেয়া নাম সে হারিয়ে ফেলেছে যৌবনের শুরুতেই, যেদিন থেকে সে চরদখলের লড়াইয়ে নেমেছিল। এখন সে চরদখলের লড়াকুদের নেতৃত্ব দেয় এই ছাব্বিশ বছর বয়সে। সমুদ্র উপকূলের চরাঞ্চলে তাগড়ার বসতি। বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা আর নিত্যদিনের অনটন মোকাবেলা করতে করতে সে বড় হয়েছে। অক্ষরজ্ঞানে একেবারে অকর্ষিত নয় তাগড়া, তবে ক্লাস সেভেনের পর স্কুল তাকে আর ধ'রে রাখতে পারেনি। আসলে ঝঞ্ঝাময় অমোঘ নিষ্ঠুর প্রকৃতিই তাকে বানিয়েছে যোদ্ধা, আর পরিবেশ দিয়েছে তাকে অদম্য সাহস। ঘনকৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘাঙ্গী তাগড়া ঘুরে বেড়ায় উদাম গায়ে বুকে পেটে তিনটি বল্লমের দাগ নিয়ে। এ দাগ তার চরদখলের লড়াইয়ের অর্জন। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে তাগড়ার নিজস্ব বিশ্বাস—তার মৃত্যু হবে আঘাতেই। এলাকাবাসীর অবশ্য ধারণা, তাগড়া মারা যাবে লড়াইয়ে। খাদ্যের ব্যাপারে তার বাছ-বিচার নেই, তবে খাবারের পরিমাণ হতে হবে তার দেহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বলবীর্যশালী তাগড়া পরাজয় দেখেনি কোনো লড়াইয়ে; আর তাই জোতদারদের কাছে তার এত কদর। পানিতে ডুব দিয়ে ঘণ্টা পার করে দেয়—এ যেন কোনো বিশেষ কৌশলই নয়।

তাগড়া যখন তার শৌর্যের শিখরে, তখনই এলো একাত্তর। লড়াইয়ের দৃশ্যমান সীমানা অতিক্রম করে হঠাৎ করেই তাগড়া হয়ে গেল জনযুদ্ধের এক দুর্ধর্ষ গণযোদ্ধা। তার একটিই দুরূহ শব্দ—পরাজয়। পাকিস্তানি পশু ও দেশীয়

AMARBOI.COM

অবিমিত্রদের প্রতি তাগড়া ছিল নির্মম। রাজাকারদের সে হত্যা করতো নিজ হাতে। সেবার বহু শ্রম ব্যয়ে বন্দি করা কুখ্যাত এক রাজাকার নেতাকে হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছে তাগড়া। আচমকা থমকে দাঁড়াল। রাজাকারের বছর পাঁচেকের শিশুকন্যা তাগড়ার লুঙ্গি ধরে তার বাবাকে ছেড়ে দিতে অনুনয় করছে। চোখে অবিশ্রান্ত জল। ক্ষমায় অনভ্যস্থ তাগড়ার কী হলো, কে জানে। শিশু মেয়েটির দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে অধিনায়ক সাঈদকে এসে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে লাগল, 'স্যার, থাক ছাইড়া দ্যান।' সহযোদ্ধারা এই প্রথম আবিষ্কার করল তাগড়ার হৃদয়ে যদি কোনো দুর্বল স্থান থেকে থাকে, তা হলো শিশু। মৃত্যুকে এতোবার এতো কাছাকাছি এতোরকম করে দেখে জীবনকে সে বোধহয় মনে করত একটা উপহার।

দুই.

নভেম্বর মাস। রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়া, হামিদ, পীরজাদা—ঢাকায়, টিক্কা, নিয়াজী, ফরমান—জাতিসংঘে আগা শাহীরা যতই চিনা-মার্কিনি স্বপ্ন দেখুক না কেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের অন্তিম ঘন্টা বাজতে যে দেরি নেই, তা তারা বুঝতে শুরু করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা অপরদিকে তখন সর্বাত্মক আক্রমণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

কোনোরকম পরিকল্পিত প্রস্তুতি ছাড়াই বরিশালবাসী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলে মার্চের শেষ থেকেই; রাজনৈতিক এবং সামরিক নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে। বহু মৃত্যু শুনতে হয়েছে শত্রুকে বরিশাল শহর দখল করতে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। জলিল, মেহেদী, শাহজাহান, জিয়া—এ বাঙালি সামরিক অফিসাররা নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন আর মাঠে শত্রুকে কাদাপানি খাইয়ে ছেড়েছে গণযোদ্ধায় পরিণত গাঁ-গেরামের মানুষ। সামান্যতম প্রথাগত অস্ত্র ও রণকৌশলের প্রশিক্ষণ ছাড়াই পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে ছিনিয়ে আনা পুরাতন, .৩০৩ বোল্ট এ্যাকশান রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে সাধারণ জনগণ। নিজেদের প্রণীত রণকৌশল, সাহস ও সাফল্যের সাথে ব্যবহার ক'রে নদীপথে চলমান শত্রুকে এবং স্থলে আক্রমণকারী হানাদারদের সর্ষেফুল দেখিয়েছে এরা। সময়োত্তীর্ণ হয়ে এরাই হলো জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা। শত্রুর মুখোমুখি রণাঙ্গনে সাঈদদের একান্ন জনের দলটি তেমনই একটি বিভীষিকা। এ দলে আছে আকবর, মানিক, তাগড়া, হিরণ, নবী, ধীরেন, কামাল, রনজু, কাওসার, সঞ্জয়, রাইস, লাল এবং মান্নানদের মতো এমনি সব দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা। এরা অকুতোভয়।

স্বরূপকাঠির শর্ষিনার পীরের বাড়িতে শত্রুর আস্তানা এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এদের সাথে আছে মিলিশিয়া (EPCAF) এবং রাজাকার। রাজাকাররা স্থানীয় এবং সেই সুবাদে শত্রুর পথপ্রদর্শক এবং সংবাদদাতা হিসেবেও কাজ করে। শত্রু লঞ্চে ও নৌকায় স্বরূপকাঠি, ইন্দেরহাট এবং অন্যান্য এলাকায় টহল দেয়। এই পশুদের অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতা দেশের মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে।

AMARBOI.COM

ইসলাম রক্ষার নাম ক'রে কী অবিশ্বাস্য পাশবিকতা। মানুষকে এরা নির্দ্বিধায় কাক-শকুনের আহার বানিয়ে ফেলে। যিনি সামান্য অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন তিনি বড়, যিনি অধিক ক্ষমা করতে পারেন তিনি মহৎ আর যিনি সবকিছুই ক্ষমা করতে পারেন তিনি একমাত্র মহান বিশ্বকর্তা। এদের কী বিবেচনায় ক্ষমা করা যায়? একমাত্র বিশ্বকর্তাই এদের ক্ষমা করতে পারেন। আকাশের নিচে কোনো মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব। আর কেউ যদি তা পারে তাহলে সেও অবশ্যই সেই পশুগোত্রীয়। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শর্ষিনার এই পীরকে ১৯৮০ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত ক'রে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তার অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। হায় গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার। জয় পশু প্রকৃতির অনুপ্রাণন)।

সুন্দরবন এলাকা থেকে ১৫/১৬টি মুক্তিযোদ্ধা দল বিভিন্ন পথে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে বরিশালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথে শত্রুর বাধা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে নির্মমভাবে। স্থানীয় জনসাধারণ তাদের শেষ সম্বলটুকু নিয়ে এগিয়ে আসছে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে। তারপরও কঠিন এ অগ্রযাত্রা। কখনও নৌকা, কখনও গরুর গাড়ি, বাকি পথ পায়ে চলা। খাবার-দাবারের ঠিক নেই, এক কাপড় আর সাথে অস্ত্র আর গোলাবারুদ। এ যাত্রার উদ্দেশ্য ফলাফলসহ অংক করা। শ্রান্তিহীন এ যোদ্ধারা তখন মৃত্যুকে দু'পায়ে মাড়ায়। বেতার যোগাযোগের অভাবে অগ্রসরমান এ দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় ছিল খুবই কম কিন্তু উদ্দেশ্য অভিন্ন।

সাঈদদের দলটি দেবহাটা-ভেটখালি (সুন্দরবন সংলগ্ন) দিয়ে সুন্দরবনের চিত্রা, শিবসা, পশুর নদী পার হয়ে বলেশ্বর অতিক্রম ক'রে নাজিরপুর-পিরোজপুর দু'পাশে রেখে পাটগাতির বিল এলাকা, কোটালিপাড়া পূর্বে রেখে বিলের মধ্য দিয়ে কোদালধোয়ায় যখনই পৌঁছেছে, ঠিক তখনই আচমকা অপরদিক থেকে অগ্রসরমান শত্রুর মুখোমুখি। সূর্য তখন মাথার উপর। দুপক্ষই অপ্রস্তুত এই সম্মুখ সাক্ষাতে। দুপক্ষই ত্বরিত প্রতিরক্ষা অবস্থান (Hasty Defence) গ্রহণ করে গুলিবিনিময় শুরু করল। এর আগে কোদালধোয়ার দক্ষিণে একটি গ্রামে হিরণের দলের সাথে সাঈদদের দলের সাক্ষাৎ ও সমন্বয় হয়েছে। শত্রুর অবিশ্রান্ত গুলির মুখে সাঈদ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শত্রুর প্রচণ্ড গোলাগুলির মুখে যখন মাথা তোলা প্রায় অসম্ভব তখন দেখা গেল ১০/১২ জন শত্রুসৈন্য ক্রলিং করে এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে সাঈদদের এলএমজি গর্জে উঠল। ৬/৭ জন শত্রুর মৃতদেহ পড়ে রইল, বাকিরা ফিরে গেল তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে। তারপরও সাঈদ তার মাথা ঠাণ্ডা রেখে তার কৌশল নির্ধারণ করে ফেলল। কেননা সে জানে এ খেলা তাদের খেলতেই হবে এবং এ খেলায় চ্যাম্পিয়ন ছাড়া কোনো রানার-আপ থাকবে না। সিদ্ধান্ত হলো হিরণের দল শত্রুর পেছনে অবস্থান গ্রহণ ক'রে (Blocking Position) শত্রুর শক্তিবৃদ্ধির বা Reinforcement-এর পথ বন্ধ করে দেবে। শত্রুর জনবল ও অস্ত্র সম্বন্ধে খোঁজ নেয়ার জন্য অবস্থানের দু'পাশ দিয়ে কিছু ছেলে অনুপ্রবেশ করবে। নিজস্ব জনবল সম্বন্ধে শত্রুকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নিজ অবস্থান

AMARBOI.COM

তিন উপদলে ভাগ ক'রে প্রতিরক্ষার সম্মুখভাগ (Frontage) বিস্তৃত করল। পরিকল্পনার শেষ দাঁড়িটি তখনো আঁকতে পারেনি সাঈদ। কেননা শত্রুর সঠিক সংখ্যা এবং তার ফায়ার পাওয়ার সম্বন্ধে যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং হিরণের দলের অবস্থান গ্রহণ সম্পন্ন বিষয়ে সংবাদ না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ এ ত্বরিত প্রতিরক্ষা অবস্থান তাকে ধ'রে রাখতেই হবে। ইপিআর-এর মর্টার প্লাটুনের সৈনিক রাইসকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে শত্রুর সরাসরি গুলির আওতার পেছনে গিয়ে একমাত্র ৩ ইঞ্চি মর্টারটি গোলা নিক্ষেপের জন্য তৈরি রাখতে। আগের রাতে বেশ কিছু স্থানীয় যোদ্ধা যোগ দিয়েছে সাঈদদের দলে। পরিকল্পনার এ পর্যায়ে সাঈদ সবাইকে ক্রলিং করে গজ পনেরো সামনে উঁচু আইলের পেছনে অবস্থান নিতে এবং গুলি বন্ধ করতে নির্দেশ দিল। সাঈদের উদ্দেশ্য 'ব্যঘ্রচক্রে'র (বাঘ শিকারীকে সামনে দেখলে পাশ দিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে পেছন থেকে আক্রমণ করে। রণকৌশলের ভাষায় যাকে বলা হয় Envelopement) মাধ্যমে শত্রুকে ধ্বংস করা। এ সবই ঘটছে চকিতে। সাঈদরা গুলি বন্ধ করার ২/৩ মিনিট পর শত্রুও গুলি বন্ধ করে দিল। হঠাৎ করেই সুনসান নীরবতা। শুকনো পাতার শব্দও তখন স্পষ্ট। তবে লড়াই অনিবার্য, কেননা পশ্চাদপসরণের পথ নেই কারো। দুই প্রতিরক্ষা অবস্থানের দূরত্ব তখন মাত্র ১৫০ গজের মতো। সাঈদ নির্দেশ দিয়ে রেখেছে তার সিগন্যাল পিস্তলের লাল সংকেত দেখা মাত্র সর্বাত্মক আক্রমণ। দু'পক্ষেরই হৃৎপিণ্ড তখন মুখে। মৃত্যু এবং বিজয় দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। নিশ্চিত সমরে অযাচিত অপেক্ষা। যে কোনো কিছু ঘটতে পারে যে কোনো সময়। নির্ভর করছে কে, কখন, কীভাবে প্রথম সুচতুর পদক্ষেপটি নেবে তার ওপর।

তিন.

অপেক্ষার অবসান টানল শত্রু প্রতিরক্ষা অবস্থানে এক বিশালদেহী সৈনিক। এসএমজি'র ব্যারেল ডান হাতে এবং কাঠের স্টক বাট বাম হাতে মাথার উপর উঁচু করে ধ'রে দাঁড়িয়ে গেল। সাঈদদের প্রতিরক্ষা থেকে অবাক যোদ্ধারা কেউই গুলি করল না। ন'মাসের ক্লান্তিকর যুদ্ধ বোধকরি একে বিরক্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হ্যায় কোই মা কি লাল? মা কি দুধ পিয়া হো তো বেগায়ের হাতিয়ারকে সামনে আ যাও।' (আছো কোনো মায়ের ছেলে? মার দুধ যদি পান করে থাকো তাহলে খালি অস্ত্রে সামনে এগিয়ে এসো)। কথা শেষ ক'রে সবার সামনে এসএমজিটা ১০/১৫ গজ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর একটানে ইউনিফর্মের সার্টটির বোতাম ছিঁড়ে গা থেকে খুলে ফেলে দিল আরেক দিকে। আমাদের ছেলেরা হতবাক হয়ে দেখছে এক পাগল সৈনিকের কাণ্ড। এবার সে একপা-দুপা করে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে এগুতে লাগলো।

AMARBOI.COM

লুঙ্গিপরা উদাম দেহের তাগড়া আর সইতে পারলো না। তার দেশে হানাদার শত্রু দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান করে বিনা মোকাবেলায় চলে যাবে? হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির কোঁচা পিছনে গুঁজতে গুঁজতে কাউকে উদ্দেশ্য না করেই বলতে লাগল, 'মরদো (লোকটা) মনে হরছে কি? বাঙালিগো মধ্যে কি কেউ নাই যে, ওর লগে বোজদে পারে? মেবাই (মিয়াভাই) তাগড়ারে আর ধইরা রাখতে পারলেন না। হালার পো হালায় বে-জাগায় হাত দেছে।' 'জয়বাংলা' বলে তাগড়াও শত্রুর সৈন্যটির দিকে এগুতে লাগল। আমাদের সবাই নির্বাক, বোধহয় শত্রুও। দুপক্ষেরই যেন এ দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখবার মৌন সমর্থন ছিল। দুজনেই এগুতে এগুতে সামনা-সামনি হলো। আধুনিক যুদ্ধে এক মধ্যযুগীয় যুদ্ধের মহড়া। এ এক যুদ্ধের নাটক, নাকি নাটকের যুদ্ধ? কয়েক সেকেন্ড দুজনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। এবার তাগড়া তার ডান হাতের খোলা আঙুলের সজোর থাবা বসিয়ে দিল শত্রু সৈনিকের বাম বুকে। প্রচণ্ড থাবার ভরবেগে শত্রুর সৈনিক পিছিয়ে গিয়ে পড়তে পড়তেও দুপায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারল। তাগড়াও পিছিয়ে গেল কয়েক পা। এদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে হলো ৪/৫ গজ। এমন সময় শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কয়েক বার্স্ট গুলি এসে তাগড়াকে ঝাঁঝরা করে দিল। তাগড়া বুকের ওপর ভর করে পড়ে গিয়ে আর একটুও নড়তে পারেনি। শত্রুর সৈনিকটি লাফিয়ে গিয়ে পড়ল তার প্রতিরক্ষা অবস্থান।

আমাদের ছেলেদের তখন মাথায় রক্ত উঠে গেছে। সাঈদ তার সিগন্যাল পিস্তল থেকে পরপর দুটি লাল রাউন্ড আকাশে ছুঁড়ল। মুহূর্তেই নিরস্ত্র এলাকাবাসীসহ সম্মুখ আক্রমণে দখল করা হলো শত্রুর অবস্থান। প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বানকারী সৈনিকটি ম'রে পড়ে আছে গায়ে পাঁচটি গুলির আঘাত নিয়ে। একশ'রও বেশি শত্রুর মধ্যে পাঁচজনকে মাত্র জীবিত পাওয়া গেল, আর সবাই মৃত। যুদ্ধবন্দি সৈন্যরা জানাল যে, তাগড়ার ওপর গুলি করার পর সৈনিকটি ফিরে এসে অন্য একটি এসএমজি নিয়ে নিজেদের সব সৈনিকদের গুলি করে হত্যা করেছে আর অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে কাপুরুষের মতো তাগড়াকে গুলি করবার জন্য।

যুদ্ধে সৈনিকের নৈতিকতা ও আচরণ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শত্রুর এ সৈনিকটিকে আমাদের অভিবাদন।

[তাগড়া, ১৭ নভেম্বর তোমার শাহাদৎ দিবস এ বাংলাদেশে পালিত হবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা নেই; যে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে তুমি ছিলে এক প্রতীকী বীর। আমাদের মধ্যে যারা মানুষ, তাদের চোখ এ মুহূর্তে আর্দ্র, তারপরও তোমাকে স্মরণ করে আমাদের বক্ষপুট স্ফীত—এ বাঙলা জননী তোমার মতো বীর গর্ভে ধারণ করেছিল।]

এলাকাবাসীর ধারণাই নির্ভুল প্রমাণিত হলো—তাগড়া মরল লড়াইয়ে। কিন্তু তাগড়ার বিশ্বাস সঠিক হয়নি, ও আঘাতে মরেনি। হতভাগাটা 'অযোদ্ধা' আর

AMARBOI.COM

'খর্বকায় বাঙালি'র অপবাদ ঘোচাতে গিয়ে মরল অপঘাতে। আর বুলেটে ঝাঁঝরা হতে হতে বেঁচে উঠেছে অমরত্বের পুনর্জন্মে। সেই সঙ্গে ছিনিয়ে এনেছে রণাঙ্গনে জয়-পরাজয়ের বাইরেও এক মহত্তম বিজয়—সাহসের অক্ষরে লেখা বাঙালির আত্মমর্যাদা।

"স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ—"

গল্পও নয়

কর্নেল শফি এক ধরণের আয়েসী মানুষ। দুপুরে অন্তত কিছুক্ষণ না ঘুমাতে পারলে মনটাই খারপ হয়ে যায়। অবশ্য এ মন খারাপের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই। স্ত্রী ঝুমু, দুই মেয়ে ইষা, তৃষাও বোঝে। কাজের ছেলে আমিরের বোঝার দরকার নেই। সে শুধু জানে, চারটার সময় স্যারের গেমস্ ড্রেস লাগাতে হবে। তৃষা ইষার দুই ক্লাস নিচে, ফাইভে পড়ে। বাবার কাছে তার কোনো আবদার নেই, সবই দাবি। সম্প্রতি দাবি তুলেছে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের কাছে নতুন একটা শিশু পার্ক হয়েছে, সেখানে যাবে। সেখানে সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেন যায়। সে সুড়ঙ্গের ভেতর আছে সশরীরী ভূত। ট্রেনের যাত্রীদের দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে আসে। শফি সময় দিয়েছে শুক্রবার বিকেলে।

কর্নেল শফির সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ছাড়াও তার স্বআরোপিত কিছু শৃঙ্খলা আছে। রাতে যখন শুতে যাবেন, তখন ঘড়ির কাঁটা দেখলে দেখা যাবে দশটা। এ অভ্যাসটা পেয়েছে তৃষাও। ইষা ও তার মা ঝুমু একেবারেই এর উল্টো। ওদের কাছে ঘড়ি নামক বস্তুটির বাহারী প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো মূল্য নেই। ক্যালেন্ডার একটা জিনিস, তারা চেনে না। মাসটা কষ্ট ক'রে বলতে পারলেও দিনটি সপ্তাহের কী বার বলতে দুজনেরই গবেষণা করতে হয়। তবে তারিখ কোনোভাবেই বলতে পারবে না। এর মধ্যেও অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। কবে, কী বারে, কোনখানে কার বিয়ে, কোন তারিখে বান্ধবীর জন্মদিন, শিল্পকলা একাডেমিতে কবে কী উৎসব—এ সব তথ্য কম্পিউটারে পাঞ্চ করার আগেই তারা বলে দিতে পারবে।

বিরানব্বয়ের প্রথম দিকে শফি পদোন্নতি পেয়ে কর্নেল হয়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, পেয়েছেন সাভার সেনানিবাসে একটি পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ড। ব্রিগেডের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব কর্নেল শফিকে একেবারে বদলে দিয়েছে। ব্রিগেডের প্রথম অধিনায়কত্ব পাওয়া ঘরে নবপরিণীতা স্ত্রীর মতো। কী করবে, কোথায় রাখবে, কীভাবে উৎফুল্ল করবে—সেসব নিয়েই ব্যস্ত। কর্নেল শফি ইদানীং দুপুরে বাসায় খেতে আসলেও ওই বড়জোর আধা ঘণ্টা। এখন রাত এগারোটার আগে বাসায়ই ফিরতে পারেন না তিনি। পিঁপড়ার ব্যস্ততা—ছুটির দিন নেই, কাজের দিন নেই।

শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটা। স্টাফ কার অপেক্ষা করছে। ইষার আগ্রহ-অনাগ্রহ প্রায় সমান, কিন্তু তৃষা উৎফুল্ল। চকমকে পোশাক পরেছে। তাড়া দিচ্ছে

AMARBOI.COM

সবাইকে। ঝুমু মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে একটা লম্বা ঘুমের। এমন সময় টেলিফোন। নবীনগর এমপি চেক পোস্ট থেকে এক এমপি টেলিফোন করেছে। কর্নেল শফি টেলিফোন ধরলেন। এমপি জানাল, রাজশাহী থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন; সাথে উনিশ/কুড়ি বছরের একটি ছেলে। দেখা করতে চান। কর্নেল শফি ভদ্রমহিলাকে টেলিফোন দিতে বললেন। ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি কর্নেল শফির পরিচিত নন। একটু দেখা করা দরকার। রাজশাহী থেকে বাসে এসে কেবল নেমেছেন। কর্নেল শফি গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আসার জন্য।

তৃষার কাছে পনেরোটা মিনিট আবদার করে অনুমোদন করাতে হলো কর্নেল শফিকে—মেহমানদের সাথে কথা বলবার জন্য। ঝুমু হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। শুয়ে পড়েছিল সে এরই মধ্যে। ইষা তার প্রিয় শখ ছবি আঁকতে বসে গেছে। তৃষা ছোট হলেও বাবার প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারে। শুয়ে শুয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কর্নেল শফি জুতা খুলে ড্রইং রুমে গিয়ে বসলেন।

ভদ্রমহিলা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক। সাথে ছেলে নিয়াজ। 'ভাই আমার ছেলেটা আর্মিতে যেতে চায়। প্রাথমিক মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লিখিত পরীক্ষা দিয়েছে।'

এটুকু শুনেই কর্নেল শফি যা বোঝার বুঝলেন। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন এই প্রথম নন। যৌক্তিক এবং গোছালো জবাব তৈরি করাই আছে। ভদ্রমহিলা কথা শেষ না করতেই মুখ খুললেন কর্নেল শফি।

'ভাবী, আর্মিতে ক্যাডেট হিসেবে ভর্তির বিষয়টা বাইরে থেকে কী রকম মনে হয় জানি না, আসলে কিন্তু পদ্ধতিটা বেশ জটিল এবং সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও পক্ষপাতহীন। ইচ্ছা থাকলেও সাহায্য করবার অবকাশ নেই।' এরপর কর্নেল শফি পরীক্ষার খাতায় কীভাবে ইনডেকস্ নাম্বার দেয়া হয়, সেটার ওপর কী করে কোড নম্বর লাগিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষকদের নিকট খাতা পাঠানো হয় ইত্যাদি থেকে শুরু করে আইএসএসবি'র বিভিন্ন পরীক্ষা, চূড়ান্ত ডাক্তারী পরীক্ষা মিনিট দশেক ধরে বেশ মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে ভদ্রমহিলাকে বোঝালেন। অন্য কেউ হলে কর্নেল শফির এ সবটুকু বোঝাতে অর্ধেক কাপ চা-ও শেষ হতো না।

'আসলে ভাই আমি এ জন্য আসিনি। নিয়াজ আমার একমাত্র সন্তান। তাই আমি এসেছি যেন ওকে একটু বুঝিয়ে রাজি করান যেন ও আর্মিতে আর পরীক্ষা না দেয়। আমি কোনোভাবেই চাই না নিয়াজ আর্মিতে যাক।'

কর্নেল শফির বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ ভদ্রমহিলা সুদূর রাজশাহী থেকে ছুটি নিয়ে বাসে কষ্ট করে এ কাজের জন্য সাভারে এসে তাকে মনোনীত করলেন কেন।

'ভাবী, না নিয়াজ আর্মিতে যাবে না।' ধীর, স্থীর, শান্ত ছেলেটি বসেছে সবচেয়ে দূরের সোফায়। গলায় স্বর একটু নিচু করে বললেন, 'ভাবী, রাজশাহীতে

AMARBOI.COM

ক্যান্টনমেন্ট আছে। ওখানে কোনো সিনিয়র অফিসারকে বললেই তো ওকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিত। মায়ের একমাত্র সন্তানের জন্য সেনাবাহিনী নয়।'

'ভাই আসলে আগেই আপনাকে আমার পরিচয়টা দেয়া উচিত ছিল। আমি শরীফের স্ত্রী।

'কোন শরীফ, ভাবী?'

'ভাই মুক্তিযুদ্ধে ও আপনার সাথে শহীদ হয়েছিল।'

কর্নেল শফি হঠাৎ করে আর শফি রইলেন না। মাথাটা ঝিম ক'রে উঠল। গণযোদ্ধা শফি শরীফের অধিনায়ক হলেও শরীফ ছিল তারই সমবয়সী। সাহস এবং বিশ্বস্ততার জন্য শরীফ ছিল শফির সব কিছুরই সহযোগী। মিঠাপুকুর টোব্যাকো লিফ ডিপোর প্রায় আধা মাইল দক্ষিণে রাস্তার পাশে সোলডারিং-এর ইট তুলে শফি আর শরীফ দু'টি এম-১৪ মাইন লাগিয়ে পাশের গ্রামে এম্বুশের জন্য অবস্থান নিয়েছিল। বাকি ছেলেদের অবস্থান ও কর্তব্য বুঝিয়ে দু'জন মাইন লাগাতে গিয়েছিল। যে পাশে মাইন, রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে একটা গাছের ডাল রাখা হলো। যেন শত্রুর গাড়ি আসলে গাছের ডাল এড়াতে গিয়ে মাইনের উপর পড়ে। গাছের ডালের সাথে দড়ি বেঁধে দড়ির অপর প্রান্ত এম্বুশ দলের একটি ছেলের হাতে রাখা ছিল। বেসামরিক গাড়ি আসলে দড়ি টেনে গাছ সরাবার জন্য; বেসামরিক গাড়ি যেন মাইনে না পড়ে।

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে রংপুরের দিক থেকে শত্রুর দু'টি ট্রাক সৈন্যসহ আসতে থাকে। এম্বুশের জন্য সবাই তৈরি। কেননা মাইনে না পড়লেও গাড়ি এম্বুশ করা হবে। শফির পূর্বেরই নির্দেশ। প্রথম গুলি ছুঁড়বে উত্তরে অবস্থিত কাট্ অফ পার্টি। সামনের গাড়িটা মাইনের উপরে পড়ে সূর্যের মতো শূন্যে উঠে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় গাড়িটির দূরত্ব বেশি থাকাতে গাড়িটি কড়া ব্রেক করে থেমে গেল। শত্রুরা লাফিয়ে প'ড়ে রাস্তার ওপারে অবস্থান নিয়ে পাল্টা গুলি শুরু করল। শফি পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দিল। মিলনস্থান পূর্বনির্ধারিত আছে। শরীফ এবং শফি একসাথেই ছিল। শরীফ অবস্থান থেকে উঠতে গেলেই ডান উরুতে গুলি লাগে। প্রচুর রক্ত যাচ্ছে। দু'জন ছেলে শরীফকে কাঁধে ক'রে নিয়ে চলেছে। শত্রু অবিশ্রান্ত ধারায় গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। শফি কোনোভাবে একটু থামতে পারছে না। কষ্ট না শত্রুর ভয়, তার চেয়ে বেশি ভয় রাজাকার আর শান্তি কমিটির হারামজাদাদের। পারলে এসে ঘেরাও দেবে। 'মুক্তি' ধরলে পাকিস্তানিরা টাকা দেয়। অস্ত্রসহ ধরতে পারলে জড় এবং জীবসহ অঢেল উপঢৌকন। কারোরই সুযোগ ছিল না শরীফের দিকে একটু তাকাবার। মিলনস্থানে এসে যখন থামল তখন শরীফ বিদায় নিয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শরীফকে প্রাণহীন করে ফেলেছে। শরীফের গোসল হলো, জানাযা হলো, সমাধি হলো। সমাধি হলো সীমান্তের একটু ভেতরে, বাংলাদেশের মাটিতে। সহযোদ্ধাদের চোখের পানি আর মাতৃভূমির মৃত্তিকা দিয়ে সমাধিস্থ করা হলো। শরীফকে কোথায় রেখে এসেছিল, শফির আর মনে নেই।

AMARBOI.COM

শরীফের স্ত্রীর দু'গাল বেয়ে পানি পড়ছে। কতক্ষণ লাগল শফির সব স্মৃতিচারণ করতে?

'ভাই, একাত্তরের আগেই আমি মা-বাবাকে হারিয়েছি। মামার কাছে মানুষ। শরীফ আর আমি কারমাইকেল কলেজে একই সাথে পড়তাম। কাঁচা বয়সের ভালোলাগা। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন আগে ১৬ মার্চ আমরা কোর্টে গিয়ে বিয়ে করি। শরীফের বাড়ি রংপুরে। বদরগঞ্জ থানার কাঁচাবাড়ি গ্রামে। শরীফের মা-বাবা আমাকে ঘরের বৌ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন না। তবুও মাটি কামড়ে পড়ে রইলম। আমাদের আলাদা আলাদা থাকতে হতো শ্বশুর-শাশুড়ির নির্দেশে। এপ্রিলের প্রথম দিকেই মুক্তিযুদ্ধে চলে গেল শরীফ। আমাকে ব'লে গেল কিছুদিন অপেক্ষা করতে। অক্টোবর মাসের এক গভীর রাতে দরজায় টোকার শব্দ। অন্ধকার নিঝুম রাত। পাড়াশুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে। দরজা খুলতেই দেখি শরীফ। সেই-ই প্রথম রাত আমরা এক সঙ্গে কাটালাম। সে-রাতে আমরা একটুও ঘুমাইনি। শেষ রাতে শরীফ বিদায় চাইল। সে যে সে-রাতেই চলে যাবে, আগে আমাকে একটুও বলেনি। আমি বললাম, একটু পরে যাও। ও বাধা শুনল না। আমি বললাম, তুমি তো ডিম পছন্দ করো, একটা ডিম ভেজে দিচ্ছি। অন্তত ডিমটা খেয়ে যাও। সময় লাগবে না। উঠানের ওপরে এক চিলতে রান্নাঘর। পাটখড়ি দিয়ে চুলা জ্বালিয়ে কড়াইয়ে ডিম ছেড়েছি, দেখি ও চলে যাচ্ছে। আমি দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম। রাখতে পারলাম না কিছুতেই। ও চলে গেল। এসে দেখি ডিমটা পুড়ে গেছে।'

দু'গাল বেয়ে পানি পড়ছে শরীফের স্ত্রীর। 'দেশ স্বাধীন হলো। আমার জীবনেও পরিবর্তন এলো। শ্বশুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলাম। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করলাম। নিয়াজ এলো কোলে। শরীফের ছেলেকে বুকে নিয়ে নিজের দু'টি দুর্বল পা নিয়ে টলতে টলতে জীবনের নিঃসঙ্গ পথ চলতে শুরু করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেলাম, মাস্টার্সেও প্রথম শ্রেণী পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতা শুরু করলাম। নিয়াজ বড় হতে লাগল। নিয়াজকে আমি শিশুকাল থেকে একটি ডিমও খেতে দেইনি, নিজেও খাইনি। পা পা করে অনেকটা পথ চলে এসেছি। আমার নিয়াজ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ক'মাসের ভালোবাসা আর ক'দিনের বিবাহিত জীবনের বন্ধু শরীফকে হৃদয়ে নিয়ে চলেছি। একটা অর্থ করবার চেষ্টা করছি জীবনের। যুদ্ধের বিভীষিকা আমার চেয়ে বেশি বোঝার লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। ভাই, আরো একটা কাজের জন্য আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে যত কষ্টই হোক না কেন, শরীফের কবরটা আমাকে খুঁজে দিতে হবে। আমার জন্য নয়, নিয়াজের জন্য। না-দেখা বাবার কাছে ওর অনেক জিজ্ঞাসা, আমি যার কিছুরই জবাবই দিতে পারি না।

ঝুমু কখন এসে বসেছিল পাশে। ভেজাচোখ নিয়াজের আর্মিতে যাওয়া হলো না। হলো না তৃষারও সেদিন শিশুপার্ক দেখা।

AMARBOI.COM

শিশু মল্লিকা ও অবিমিশ্র দিগন্তের কাহিনী

যারা একাত্তর দেখেনি, একাত্তরে যাদের জন্ম হয়নি বা একাত্তরে যারা ছিল শিশু, তাদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার আছে। আমাদের, আমরা যারা একাত্তরকে প্রত্যক্ষ করেছি সরাসরি, অস্ত্র হাতে লড়েছি ঘরের এবং বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে, আমাদের দায়িত্ব তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী শোনাবার।

একাত্তরের আগস্ট মাস। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের বাংলাদেশি সহযোগীদের নিয়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে, লুট করছে সম্পদ, অত্যাচার করছে নিষ্ঠুরভাবে। শত্রু তাদের এই স্থানীয় দোসরদের নিয়ে গঠন করল রাজাকার বাহিনী। কিছু কিছু প্রাণী আছে যাদের হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান, মাথা সবই দেখতে মানুষের মতো; কিন্তু এরা মানুষ নয়, এরা পশু।

এরা এই অত্যাচার, হত্যা এবং লুটতরাজ করত ইসলাম রক্ষার নামে মিথ্যা কথা বলে। ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং ইসলাম নাজিল করা হয়েছে মানুষের ওপর, পশুদের ওপর নয়। এই পশুদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ বাস্তুভিটা ছেড়ে তখন পালাচ্ছে। অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। শিশু, নারী, পুরুষসহ এদের নিরাপদে ভারতে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে তৈরি হলো কিছু দালাল। এরাও ছিল পশু শ্রেণীর। মালবাহী বড় বড় নৌকা করে এই দালালরা অর্থের বিনিময়ে চুক্তি করে এদেরকে ভারতে নিয়ে যাবার অঙ্গীকার করত। আসলে রাজাকারদের সাথে ছিল এই দালালদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কুমিল্লা, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা অর্থাৎ নদী-নালায় সমৃদ্ধ এলাকার লোকজন এভাবে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভারতের ত্রিপুরা যেত। এই নৌ-পথের এক পর্যায়ে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কে তন্তর নামের একটি সেতুর নিচ দিয়ে পার হতে হতো। তন্তর সেতুর কাছে নৌকা পৌঁছলেই এই দালালরা স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় নৌকার সব আরোহীদের নির্বিচারে হত্যা করে তাদের সঙ্গে রাখা টাকা, পয়সা, স্বর্ণালঙ্কার এবং অন্যান্য মালামাল লুট করে নিতো। ভাবা যায় সে দৃশ্য কী বর্বর, কী নিষ্ঠুর, কী নির্মম।

আমাদের সামরিক অবস্থান ছিল তন্তর সেতু এলাকা থেকে ছয় সাত মাইল দূরে। প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে শুনতাম। কিন্তু আমাদের সমস্যা ছিলো দুটো। প্রথমত, জলপথ ছাড়া সেখানে পৌঁছনো যেতো না এবং তার জন্য একমাত্র বাহন ছিল দেশি নৌকা। দ্বিতীয়ত, আমাদের মুখ্য কাজ ছিল শত্রুর ক্ষতিসাধন ও হয়রানি করা। তবুও আমরা দু'বার দালাল-রাজাকারদের হত্যাযজ্ঞের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেরিতে পৌঁছবার কারণে কিছুই করতে পারিনি।

AMARBOI.COM

এরপর আমরা দ্রুতগামী কিছু নৌকা জোগাড় করে রাখলাম পরবর্তী ঘটনা মোকাবেলা করার জন্য। স্থানীয় ভাষায় এ নৌকাগুলোকে সরোংগা নৌকা বলে। ভারতগামী নৌকাগুলো আসত বহরে। রামচন্দ্রপুর, সাতমোড়া, পিপিরা, চন্দনাইল, মালাইবাংগোরা হয়ে যে খালটি দিয়ে নৌকাগুলো আসত, সে খালটির নাম অদের খাল। খালের পাড়ে পাড়ে আমরা লোক নিয়োগ করলাম নৌকার আগাম খবর পাবার জন্য। কিছুদিন পরের ঘটনা। খবর এলো নৌকার বহর যাচ্ছে এবং রাজাকার-দালালরা এদের ওপর নিত্যকার মতোই আক্রমণ চালাবে। আমরা কালবিলম্ব না ক'রে প্রস্তুতি নিয়ে সরোংগা নৌকায় রওনা হলাম। গুলি করে হত্যা করতে লাগলাম রাজাকার ও দালালদের। বন্দিও করলাম এদের অনেককেই। উদ্ধার করা হলো জীবিত লোকদের। সমস্যা হলো এদের অনেকেই আহত; কেউ কেউ মারাত্মকভাবে। আমরা তাদের সবাইকে তাদেরই নৌকায় করে চন্দনাইল নামের দূরবর্তী একটি গ্রামে নিয়ে এলাম। তারপর যা আবিষ্কার করলাম; তা কল্পনায়ও আনা কঠিন। অনেকেরই নিকটআত্মীয় খুন হয়েছে। কারো বাবা মারা গেছে, কারো মা মারা গেছে, কারো সন্তান, কারো বা অন্যান্য নিকটআত্মীয়। স্বজনহারাদের আহাজারি আর আহত মানুষের আর্তনাদে নিশ্চুপ নিরিবিলি চন্দনাইল গ্রামের এই পরিবেশটি ভারি হয়ে উঠলো।

রাতটা কাটল নিদ্রাহীন। ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, চিকিৎসার সরঞ্জাম নেই, তার মধ্যেই সাধ্যমতো আমরা আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করলাম রাতভর। ভোর হলো। এ ভোরটা স্বাভাবিক ভোর নয়। রাতেই আহতদের কয়েকজন মারা গেল। এদের শেষকৃত্য করতে পাঠালাম কয়েকজনকে। সমস্যা কিন্তু তারপরও এ সবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। কেননা কতদিন আমরা এদের এখানে রাখতে পারবো এবং কীভাবে পাঠাবো এতগুলো লোককে নিরাপদে এদের গন্তব্যস্থানে, সে ভাবনাটাও অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিলো। আমরাই থাকি অন্যের বাড়িতে। আমাদের টাকা নেই। তাছাড়া হিন্দুদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, এ অজুহাতে পাকিস্তানি পশুরা এ গ্রাম ধ্বংস করে ফেলবে। এক প্রৌঢ়া মহিলা হারিয়েছেন তার একমাত্র ছেলে এবং ছেলের বৌকে। দু'বছর বয়সের একমাত্র ছোট্ট নাতনিকে নিয়ে শোকে পাথর হয়ে ছিলেন। 'মাসীমা' বলে সম্বোধন করেছি মহিলাকে। মল্লিকা নামের হাস্যোজ্জ্বল, চটপটে এই ছোট্ট মেয়েটিকে মনে হলো তার দিদিমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ। কেননা তার বাবা এবং মায়ের অনুপস্থিতি সে উপলব্ধি করছে বলে মনেই হলো না। সকালে ভাবলাম মাসীমাকে দেখে আসি। ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে মল্লিকা। কী সুন্দর করে ছোট ছোট পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুট পুট করে পাকা পাকা কথা বলে চলেছে সবার সাথে। ফুলের মতো সুন্দর বলেই হয়তো বাবা-মা ফুলের নামে তার নাম রেখেছিল মল্লিকা। মজার বন্ধু আমাদের মল্লিকা। এত মিশুক, এত সংকোচহীন একটা ছোট্ট বন্ধুর সাথে গল্প করতে কার না মন চায়। কিন্তু সেদিন কেউই মল্লিকাকে সঙ্গ দিচ্ছে না। কেউই কথা বলছে না মল্লিকার সাথে। কারণ সবাই তাদের স্বজনহারানোর ব্যথায় বিহ্বল। তাছাড়া ভবিষ্যতের ভাবনা সবাইকে আতঙ্কগ্রস্থ করে রেখেছে। মল্লিকার

কি তাতে কিছু এসে যায়? এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর নির্মমতা কি মল্লিকা বোঝে? সে কি বোঝে মামণির বুকে শুয়ে আর কোনোদিনও সে রূপকথার গল্প শুনতে পাবে না? সে কি বোঝে দৌড়ে গেলে দু'হাত বাড়িয়ে বাবা আর তাকে চুমু দিয়ে কোলে তুলে নেবে না? কোনদিনই না। শিশুদের জগতই ভিন্ন। সে জগতে হত্যা নেই, বর্বরতা নেই, প্রতিহিংসা নেই। শিশুদের ভুবনের মাধুর্যতা তো সেখানেই।

'বাবা তুমি এসেছ?' বলে অতি আদরের সাথে আমার গায়ে হাত রাখলেন মাসিমা। মুখে কথা সরলো না, তবুও মাসীমার পাশে গিয়ে বসলাম। মাসীমা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'বাবা তোমরা ছিলে বলেই বেঁচে আছি। তোমরা আমাদের জন্য যা করেছো আর যা করছো তার ঋণ বাবা শোধ দেবার নয়।' আরো কত কথা। মল্লিকা পাশে দাঁড়িয়ে। বোধহয় অবাক হয়েই দেখছিল তার দিদিমা একটা অপরিচিত লোককে কেমন করে আদর করছে। আমি কিছুই বলছিলাম না। আসলে আমার বলার কিছুই ছিল না। এমন সময় মল্লিকা তার ছোট্ট হাত দিয়ে তার দিদিমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করল—দিদিমা, দিদিমা তোমার যদি বাবা হয়, তাহলে আমার কী হবে? হঠাৎ করেই আমার চোখে পানি এসে গেল। মাসীমার দিকে তাকাতেই দেখি মাসীমারও চোখে জল। চোখের পানিরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে—মানুষরূপী পশুদের চোখে এটা আসে না।

মল্লিকাকে আমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে চাইলাম। কিন্তু মল্লিকা তো এ জবাব বুঝবার জন্য খুবই ছোট। ও বুঝবে না। যেমন বুঝবে না এখনকার শিশুরাও। সব কথা সহজ করে বলা যায় না। মনে মনে বললাম, 'মামণি, মানুষ মানুষের সব কিছুই হয় আবার কিছুই হয় না।' মল্লিকা বেঁচে থাকলে এখন বড় হয়ে গেছে। সেই দিনগুলো তার আর মনে থাকবার কথা নয়। যে কথাটা মল্লিকার হৃদয়ে আমৃত্যু ভারি পাথরের মতো চেপে আছে তা হলো, পশুরা তার বাবা-মাকে হত্যা করেছে।

জীবনটাই একটা যুদ্ধ। একাত্তরের সেই পশুরা অনেকেই আজো আমাদের মধ্যে আছে। দেখতে এখনো ওরা ভালো মানুষ। কিন্তু পশু তো পশুই। এদের নির্মূল করার যুদ্ধে আমরা জিততে পারিনি। এ ব্যর্থতা আমাদের। আমাদের সন্তানরা কিন্তু পরাজিত হতে পারবে না। তাদের জিততেই হবে। শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, এ দেশ, এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য রাখার জন্যও। অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে হেরে যাবার কোনো অবকাশ নেই। তারা যখন বড় হবে তখন এই পশুগুলো বেঁচে থাকবে না হয়তো। কিন্তু পরম্পরায় এদের অনুসারী, অনুগামীরা বেঁচে থাকবে। কোনোভাবেই আমাদের সন্তানরা হারতে পারবে না। জিততেই হবে তাদের, কেননা এ যুদ্ধে রানার-আপ নেই, পরাজিত হলে এই পশুরা আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতার ইতিহাস কলঙ্কিত করে ফেলবে। যেদিন আমাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজবে, সেদিন আমাদের যেনো চোখে পানি নিয়ে চোখ বন্ধ করতে না হয়। আমরা তাকিয়ে আছি সেই অবিমিশ্র দিগন্তের দিকে।

AMARBOI.COM

রাখাইন মেয়ে প্রিন্‌ছা

রাখাইন মেয়ে প্রিন্‌ছা খেঁ। টেকনাফে তার আদিবাস। পাহাড়, পানি, অরণ্য আর সৈকতে তার বিহার; নিসর্গে তার বেড়ে ওঠা। সত্তরের নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাসে সব হারিয়ে নিগ্রন্থ হয়ে যায় প্রিন্‌ছা। সংগ্রাম যার সত্তা, সে অবলা হয় কী করে। অষ্টাদশী প্রিন্‌ছা ক্রুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক দ্রোহী। নিঃসঙ্গ পথ চলায় অনভ্যস্ত হলেও দুর্মর প্রিন্‌ছার ভ্রূক্ষেপ নেই। শোকের পাহাড়ও তাকে নোয়াতে পারেনি।

আপাত সৌন্দর্যের কিছুই নেই প্রিন্‌ছার আদলে। আজন্মসখী নিসর্গই নিজের রূপে রূপবতী করেছে প্রিন্‌ছাকে। ত্বকে তার ভর করেছে তাজা গোলাপের রঙ। এক জোড়া ক্ষুদ্র গোলাকার চোখ আর চ্যাপ্টা নাকটা ছাড়া যেন তার মোহনীয়া রূপ অপূর্ণ থাকতো। অবয়বে লক্ষণীয় বিচিত্রতা ছাড়াও প্রিন্‌ছা লাবণ্যময়ী এক তরুণী। ঠোঁটে লেপ্টে থাকা হাসিটিও কেড়ে নিতে পারেনি ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাস। অক্লিষ্ট প্রিন্‌ছা জলোচ্ছ্বাসের পর আর্তের সেবায় আসা এক মেডিকেল টিমের সাথে যোগ দেয়। এক জাপানি দম্পতি, এক বৃটিশ তরুণী আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের এই ছোট্ট মেডিকেল টিমে চাল-চুলোহীন আমাদের প্রিন্‌ছা হয়ে গেল এক সফেদ নার্স; ব্যস্ত হয়ে উঠল দুস্থের সেবায়। মেডিকেল টিমটি একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে চলে আসে পটুয়াখালীর উপকূল অঞ্চলের কুয়াকাটা সৈকত এলাকায়; সাথে প্রিন্‌ছাও।

দুই.

একাত্তরের তিন এপ্রিল। বরিশাল তখনো শত্রুমুক্ত শহর। ছুটিতে আসা মেজর জলিল স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদী যুবকদের সংগঠিত করছেন মুক্তিযুদ্ধে। সমাবেশিত যুবকদের বোঝালেন এ যুদ্ধ অস্তিত্বের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে পরাজিত হবার কোনো অবকাশ নেই। শেষে আহ্বান করলেন তাদের মধ্যে কে কে 'আত্মঘাতী দলে' (Suicide Squad) যোগ দিতে আগ্রহী। রক্তে তাদের তখন প্রতিশোধস্পৃহা, অন্তরে লালিত স্বপ্নসাধ—স্বাধীনতা। সাথে সাথেই কামাল, তোফাজ্জল, বুলু, নবী, সাঈদ, নূরুল হুদাসহ আটজনের হাত খাড়া হয়ে উঠল আকাশে। এ আটজনকে দিয়েই তৈরি হলো 'আত্মঘাতী দল'। মেজর জলিল এদের শপথ গ্রহণ করালেন এবং শপথনামা নিজ নিজ পকেটে রাখতে নির্দেশ দিলেন। এ শপথনামা শুধু তাদের পরিচয়পত্রই নয়, দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্মরণনামাও। নূরুল হুদার নেতৃত্বে

AMARBOI.COM

এদের পাঠানো হলো কুয়াকাটায়। একটি বিদেশী জাহাজের অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে কুয়াকাটা আসার কথা। সেই জাহাজের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে খবর নিয়ে আসা এ দলের কাজ। বরিশাল শহরের জনৈক কামাল চৌধুরীর ঢাকা-বরিশাল নৌপথে যাতায়াতকারী এমভি শাহারুন্নেছা সে-সময়কার আধুনিক ও দ্রুতগামী লঞ্চ। অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় গোলাবারুদসহ শাহারুন্নেছায় রওনা হলো দলটি। ৮ এপ্রিল পৌঁছল কুয়াকাটায়। কয়েকদিন ধ'রে বহু খোঁজাখুঁজির পরও তেমন কোনো জাহাজের খবর পাওয়া গেল না। কুয়াকাটা পৌঁছনোর পরই এদের সাক্ষাৎ হলো মেডিকেল টিমটির সাথে। দুপুরের খাবার আয়োজন করেছে মেডিকেল টিমের সদস্যারা। প্রিন্‌ছা সবাইকে ডাব কেটে খাওয়াচ্ছে। তিন বিদেশীর পূর্ণ সমর্থন এই স্বাধীনতা যুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র তাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দিতে চাইল। কিন্তু তাদের নেয়া সম্ভব হলো না রণকৌশলগত বিবেচনায়। প্রিন্‌ছার বেশ আর রূপ তন্ময় হয়ে দেখছে সাঈদ। চোখ সরাতে পারছে না কিছুতেই। সেদিনই বিজন ছায়ায় সাঈদ প্রিন্‌ছার কাছে হৃদয় সমর্পণ করল। লাস্যময়ী প্রিন্‌ছার হাসি হঠাৎ মিলিয়ে গেল। সাঈদদের দিকে আর তার হাতিয়ারের দিকে তাকাল বারকয়েক। রাখাইন মেয়ে তারপর শান্ত স্বরে সাঈদকে বর্ণনা করল তার প্রেম ও যুদ্ধের দর্শন। বোকা সাঈদ হতবাক হয়ে শুনছে। 'এখন তুমি যুদ্ধে যাচ্ছো। এই অস্ত্রটির যত্ন নিও। যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন এই অস্ত্রটিই তোমার প্রেয়সী, এই অস্ত্রটিই তোমার প্রিন্‌ছা। আমি তোমার কথা বুঝেছি। যুদ্ধ শেষ হোক, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।' সাঈদ কিছুই বলল না। বলবারও কিছু ছিল না। সে শুধু তার মুষ্টিবদ্ধ হাতিয়ারটাকে আরো শক্ত ক'রে চেপে ধরল।

তারপরের দিনগুলো শুধুই প্রাণসংহারী খেলা। শত্রু নিধন করেছে, সহযোদ্ধাদের হারিয়েছে, খেলা থেমে থাকেনি—এ খেলার লক্ষ বিজয়। হাতিয়ারটি পরিষ্কার করতে গিয়ে বা সম্মুখ সমরে হাতিয়ারটিতে ম্যাগজিন লোড করতে গিয়ে অবচেতনেই এসে যেতো প্রিন্‌ছা—দৃষ্টির বাইরেও যেন দৃশ্যময়ী। দেহাতি মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, তাদের শেষ সম্বলের সমর্থন আর উৎসাহ প্রেরণা যুগিয়েছে যুদ্ধে, জীবনকে করেছে কষ্টসহিষ্ণু। বহু ত্যাগ আর অঢেল রক্ত অবশেষে এনেছিল এক প্রস্থ পতাকা-বাংলা নামের দেশের।

তিন.

এপ্রিল, বাহাত্তর। বরিশাল শহরে মনোরমা মাসিমার বাড়িতে সংস্কৃতিমনা ও বাম চিন্তার যুবকদের আড্ডার আখড়া। স্বাধীনতাপূর্ব গণআন্দোলনের সময় সাঈদ নিজের লেখা গণসংগীতে নিজেই সুর দেয়, নিজেই গায়। তখন সে সংবাপত্রের সাথেও জড়িত। মঞ্চেও তার বিচরণ। সেই সুবাদে মনোরমা মাসিমার বাড়ির আড্ডায় রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করল : প্রিন্‌ছা সেখানে। সাঈদ এবং

AMARBOI.COM

প্রিন্‌ছা নিশ্চুপ মুখোমুখি। মুখ খুলল প্রিন্‌ছা, 'আমি তোমার জন্যই বোধহয় বেঁচে আছি।' বাকরুদ্ধ সাঈদ অপলক দৃষ্টিতে দেখছে প্রিন্‌ছাকে। 'তুমি আমাকে সেদিন যে প্রস্তাব দিয়েছিলে আজ আমি তোমার সে প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুত। এখন তুমিই বলো, রাজি কিনা। তবে তোমার মতামত জানাবার আগে আমার কিছু জরুরি কথা তোমাকে বলার আছে।' হতবাক সাঈদ কিছুই ধারণা করতে পারছে না। বলল, 'বলো।' প্রিন্‌ছা বলল, 'সময় লাগবে। অনেক কথা এবং বলতে হবে নির্জনে এবং একান্তে।' মোহাবিষ্ট সাঈদ লক্ষ্য করছে প্রিন্‌ছা বদলায়নি, না রূপে, না রূপায়ণে। বরিশাল শহরের চার/পাঁচ মাইল উত্তরে লাকুটিয়া জমিদার বাড়িতে সারারাত হারিকেনের নিবু নিবু আলোয় অনর্গল বলে গেল প্রিন্‌ছা। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে শুনছে সাঈদ।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কনিষ্ঠতম আসামী সুরেন বাবুকে ইংরেজরা কয়েক মাস জেলে রেখে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয় বরিশালের উপকূল অঞ্চলে খেপুপাড়ার এক গ্রামে। তার গতিবিধি এবং কর্মকাণ্ডের তদারকির ভার দেয়া হয় স্থানীয় থানাকে। পরবর্তীতে সুরেন বাবুর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলেও তিনি সেখানেই থেকে যান। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা আর জনসেবা করে দিন চালাতে থাকেন। ষাটের দশকে সাধনা ঔষধালয়ের কর্ণধার যোগেশচন্দ্র ঘোষ তাকে সাধনা ঔষধালয়ের স্থানীয় এজেন্সী প্রদান করেন। এ ব্যবসায় তার বটুয়া পূর্ণ হলেও সে অর্থের প্রায় সবই সুরেন বাবু জনসেবায় ব্যয় করেন। তবে তার অভাবও ঘোচে। এই সুরেন বাবুই কন্যাস্নেহে তার ঘরে আশ্রয় দেন প্রিন্‌ছাকে। ক'মাসের মমতায় আপ্লুত প্রিন্‌ছার সুখে অমোঘ নিয়তি বাধ সাধল। জুলাই মাসে পাথরঘাটা থানায় পাকিস্তানি পশুরা বর্বর উল্লাসে সুরেন বাবুকে হত্যা করে। ভোগের উপরি সামগ্রী হিসেবে পেয়ে যায় প্রিন্‌ছাকে। পিতৃসম সুরেন বাবুর নির্মম মৃত্যু প্রিন্‌ছার হৃদয় বিদীর্ণ করে ফেলে। তবুও প্রিন্‌ছার বিলাপের সময় ছিল না। তার তখন উজান বাইবার দিন, নিঃসঙ্গ যুদ্ধের মন খেলানো প্রস্তুতি। প্রিন্‌ছার বুদ্ধিন্দ্রিয় তাকে বলেছে নিজেকে তার ওই জড় দেহ থেকে বের ক'রে আনতে। ওই দেহ নিয়ে উল্লাস করুক পশুরা। তাকে লড়তে হবে তার মতো ক'রে। খুলনা থেকে ঝালকাঠির পথে গাবখান খালের মাথায় বাউকাঠি গ্রামে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। খুলনা নৌশাল নৌপথের দূরত্ব কমানোর জন্য খনন করা হয় কৃত্রিম এই গাবখান খাল। অপ্রস্থ এ খালটি রণকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাউকাঠি ক্যাম্পের দায়িত্ব এ খালের নিরাপত্তা বিধান করা। প্রিন্‌ছা হাত বদল হয়ে থিতু হলো শত্রুর এই ক্যাম্পে।

গত্যন্তরহীন প্রিন্‌ছা তার চলনে বলনে আচরণে শত্রু সৈন্যদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। শয্যার বাইরেও প্রিন্‌ছার মধুর সান্নিধ্যে ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল কয়েকদিনেই। আর্মির দুই বাবুর্চির সাথে যুক্ত হয়ে প্রিন্‌ছা হয়ে গেল তৃতীয় বাবুর্চি। ভাত, মাছ, ভর্তাসহ দেশীয় সব খাবারে শুধু অভ্যস্তই নয়, প্রচণ্ড আগ্রহী করে ফেলল শত্রুদের। মাছের কাঁটা বেছে দেয়াও নিপুণভাবে করত প্রিন্‌ছা।

AMARBOI.COM

একসময় বোম্বাই মরিচও খাওয়া শিখিয়ে দিল সবাইকে। ক্যাম্পের সবার আপনজন হতে প্রিন্‌ছার সময় লাগল না। অবসরে শত্রুসৈন্যরা তাদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র খোলা-জোড়া আর চালনা শেখায় প্রিন্‌ছাকে। ক্যাম্পের সৈনিকদের খাদ্যাভাসও প্রায় বদলে গেল। ভাত, মাছ প্রতিবেলাতেই রান্না হতে হবে। আর প্রিন্‌ছার মতো অত উপাদেয় রান্নার বাবুর্চিই বা তাদের আর কই। বাড়তি নারীস্পর্শ। সময় হলো যখন, ওরা প্রিন্‌ছাকে বিকল্পহীন মনে করতে লাগল।

এটাই উদ্দেশ্য ছিল প্রিন্‌ছার। শত্রুর পূর্ণ আস্থা এবং তার ওপর তাদের নিখাদ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন ফেলল এই মেয়ে। ক্যাম্পে জ্বালানি কাঠ সরবরাহকারী বাবুলের সাথে গোপনে পরিকল্পনা করতে লাগল প্রিন্‌ছা। অক্টোবরের কোনো এক দিন প্রিন্‌ছা ক্যাম্প অধিনায়ক সুবাদারকে জানাল যে সে অসুস্থ, ঝালকাঠিতে ডাক্তার দেখাতে হবে। এক হাবিলদার, এক সিপাইসহ বাবুল আর প্রিন্‌ছা এলো ঝালকাঠি ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রিন্‌ছা বলল, সে অন্তঃসত্ত্বা; গোপনে কথা বলবে। পেছনের ঘরে গিয়ে ডাক্তারকে সে বলল, আসলে সে অন্তঃসত্ত্বা নয়। কিন্তু ডাক্তার যেন পাকিস্তানি হাবিলদারকে বলে যে, সে অন্তঃসত্ত্বা; এ মুহূর্তে গর্ভপাত করানো সম্ভব নয়, ভ্রূণ বড় হতে হবে, মাস তিনেকের ব্যাপার এবং প্রতি চার দিন পর পর তাকে ডাক্তারের কাছে পরীক্ষার জন্য আসতে হবে।

প্রিন্‌ছা ডাক্তারের কাছে যায় এখন প্রহরাহীন। পালায় না। বিশ্বস্ত প্রিন্‌ছা তার 'দায়িত্ব ও কর্তব্য' সব পালন করে যাচ্ছে পশুগুলোর ইচ্ছেমতো। চতুর্থবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে এবার অনুরোধ নয় আদেশ করল প্রিন্‌ছা। বলল, তার বিষ চাই। এমন বিষ যা স্বাদহীন, গন্ধহীন এবং খাওয়ামাত্রই মৃত্যু হবে। বলা শেষ করে আরেক দফা শাসিয়ে দিল ডাক্তারকে। পাকিস্তানিরা যদি কোনোভাবে এ কথা জানতে পারে তাহলে সে পাকিস্তানিদের দিয়ে ওকে ওর গোটা পরিবারসহ হত্যা করবে। পাকিস্তানিরা ডাক্তারের চেয়ে তাকেই বিশ্বাস করবে বেশি। কারণ ও ওদের আনন্দভোগের সাথী। ডাক্তার হঠাৎ করে আর ডাক্তার রইল না। পিতার আসনে আসীন ডাক্তার জানাল যে, তার ছেলেও মুক্তিযোদ্ধা। সেই যে যুদ্ধে গেছে আজো খোঁজ নেই। অবশ্যই সে বিষ জোগাড় করবে, তবে কয়েকদিন সময় লাগবে। এ ধরনের বিষ ঝালকাঠিতে নেই, সদর (বরিশাল) থেকে আনতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় সময় নিয়ে খুব যত্ন করে রান্না করল প্রিন্‌ছা। ভাত, মাছ, রুটি, সবজি, ভুনা গরুর মাংস, ডাল—সব খাবারের মধ্যে গোপনভাবে মেশানো হলো কঠিন বিষ। ক্যাম্পের সব সৈনিকদের একসাথে বসিয়ে নিজ হাতে অন্যান্য দিনের চেয়ে যত্ন করে খাওয়াল প্রিন্‌ছা। তার আগে রান্নাঘরে দুই পাকিস্তানি বাবুর্চিকে খাইয়ে এসেছে। খাওয়া শেষে সবাই অচেতন। নীরব হয়ে গেল পশুদের সরব আখড়া। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাবুলের সাথে প্রিন্‌ছা পালিয়ে যায় নাজিরপুর। বাবুল তাকে বলেছিল নাজিরপুরে মুক্তিযোদ্ধারা আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের

AMARBOI.COM

না পেয়ে লঞ্চে চলে এলো বরিশাল। এখানে এসে শুনলো পাকিস্তানিরা তাকে হন্যে হয়ে সব জায়গায় খুঁজছে। বাউকাঠি ক্যাম্পের ৪২ জন শত্রুর মধ্যে ১৪ জন অচেতন অবস্থায় মারা গেছে। বাকিদের সংকটাপন্ন অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ খবর শুনে প্রিন্ছা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তার এবারের উদ্দেশ্য ঝালকাঠির ডাক্তারকে হত্যা করা। প্রিন্ছার বিশ্বাস ডাক্তার তার সাথে বেঈমানী করেছে, তাকে ভেজাল বিষ দিয়েছে। তা নইলে সব শত্রু মরল না কেন। বরিশাল তার জন্য বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠল। দুদিন লুকিয়ে থেকে বোরখা পরে চাপল ঢাকার লঞ্চে। দেশ স্বাধীন হবার পর ফিরে এলো বরিশাল শহরে।

গল্পের শেষে এসে হঠাৎ করেই ঝলকে উঠল প্রিন্ছা। শক্ত চোয়ালে উচ্চকণ্ঠে স্বগতোক্তি করতে লাগল, নিশ্চয়ই আমার বিয়ে হবে। কেন হবে না? আমি কি কোনো খারাপ মেয়ে? আমি কি কোনো খারাপ কাজ করেছি? আমি তো যুদ্ধ করেছি, পাকিস্তানি শত্রু মেরেছি। তারপর আবার হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল এক চিরদ্রোহী নারী। মুখ খুলল বেশ ক'মিনিট পর। "এখন বলো আমার এ দেহটা সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার নয় শত্রু হননে? এ হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ কোটি মানুষের মুক্তির জন্য, মুক্তিযুদ্ধের জন্য। জানো, আমার এ দেহ, রূপ-লাবণ্য লালিমার জন্য আমি গর্বিত। মুক্তিযুদ্ধে এমন হাতিয়ার দেখেছো কি? তোমার হাতের ঐ অস্ত্রটি এবং আমার এ দেহ-অস্ত্র কি একই অস্ত্র নয়? এমন একটা মুক্তিযুদ্ধ না এলে কী করে জানতাম, আমি একজন প্রিন্ছা—একটি সুতীক্ষ্ণ আবেগময় হাতিয়ার?"

মুক্তিযুদ্ধের কোনো বৈষায়িক বিনিময় ছাড়াই স্বামী সন্তানদের নিয়ে সুখে আছে প্রিন্ছা। এন্তার বিলাসসামগ্রী নিয়ে সুখে নেই শুধু আমরাই। প্রিন্ছাদের জ্বালানো আকাশপ্রদীপ আমরা চোখ মেলেও দেখছি কই? হা দেশ!

AMARBOI.COM

দুই পরদেশী

এক : উইলিয়াম আব্রাহাম সাইমন ঔডারল্যান্ড

ঔডারল্যান্ডের শেকড় অস্ট্রেলিয়ায়—পিতৃভূমি। যদিও তার জন্ম হল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামের অত্যন্ত সাধারণ এক পরিবারে; ৬ ডিসেম্বর ১৯১৭। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ তেমন হয়ে ওঠেনি। মাত্র সতেরো বছর বয়েসে জীবিকার প্রয়োজনে যোগ দেন এক ছোট চাকরিতে। পরে বাটা সু কোম্পানিতে চাকরি নেবার কিছুদিন পর ডাচ্ ন্যাশনাল সার্ভিসে নাম লেখান ১৯৩৬ সালে। নাৎসি জার্মানি কর্তৃক হল্যান্ড আক্রান্ত হবার আগ মুহূর্তে তার ডাক পড়ে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করার। ডাচ্ রয়্যাল সিগন্যাল কোরে যোগ দেন সার্জেন্ট হিসেবে। তার ৩৬ জনের প্লাটুনের সবার কাছে শুধু খাটো ব্যারেলের রাইফেল এবং জনপ্রতি মাত্র ১২টি করে গুলি। ভয়াল জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক, বিমান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের তুলনায় ডাচ্দের অস্ত্র সব নস্যি। ঔডারল্যান্ড যখন তার প্লাটুন নিয়ে জার্মানদের মোকাবেলায় যাচ্ছেন তখনই লক্ষ করলেন, মাথার ওপর দিয়ে আকাশ কালো করে ধেয়ে যাচ্ছে জার্মান বিশাল বিমান বহর তার দেশের দিকে। ৩০ মিনিটের মধ্যে হল্যান্ডের রটারডাম শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। স্বল্প অথচ এই ক্ষিপ্র ও ব্যাপক বিমান হামলা ছিনিয়ে নিলো ৩০ হাজার হল্যান্ডবাসীর জীবন। ১৯৪০ সালের কথা। রটারডাম ধ্বংসযজ্ঞের সাথে সাথেই হিটলার ঘোষণা করল অবিলম্বে আত্মসমর্পণ না করলে হল্যান্ড, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের অন্যান্য শহরগুলোকেও রটারডামের ভাগ্য বরণ করতে হবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হল্যান্ড, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম জার্মান জান্তার দখলে চলে এলো। ঔডারল্যান্ড বন্দি হলেন জার্মানদের হাতে। বর্বর জার্মানদের হাতে যুদ্ধবন্দির জীবনের বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। খুব অল্প সময়ই জার্মানরা আটকে রাখতে পেরেছিল ঔডারল্যান্ডকে। জীবনের সব ঝুঁকি নিয়ে জার্মান বন্দি শিবির থেকে পালিয়ে এলেন ঔডারল্যান্ড। ১৯৪১ সালে জার্মান থেকে যুদ্ধফেরত সৈনিকদের ক্যাম্পের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করলেন কিছুদিন। সতেজ ঔডারল্যান্ড এক সত্যাগ্রহী সৈনিক। তিনি যোগ দিলেন ডাচ্ গোপন প্রতিরোধ আন্দোলনে। জার্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলতেন ঔডারল্যান্ড। তাছাড়া তিনি ডাচ্দের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ছিলেন পারঙ্গম। তিনি জার্মান গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে জার্মান সামরিক নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠতা ও অগাধ আস্থা অর্জন করেন। জার্মানদের গোপন

AMARBOI.COM

আস্তানায় অবাধ চলাফেরার অধিকারও তিনি পেয়ে যান। জন্মভূমির সাথে থাকে জন্মের টান, নাড়ির টান। জার্মানদের গোপন সংবাদ তিনি ডাচ্ গোপন প্রতিরোধ আন্দোলন এবং মিত্রশক্তির সামরিক নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে যান। ১৯৪৩ সালে তিনি কমান্ডো বাহিনীতে যোগ দেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে ঔডারল্যান্ড এক চিঠিতে লেখেন : "Having escaped from the POW[১] camp after a short internment, I joined the Dutch Underground Resistance Movement. As I spoke fluent German and several Dutch dialects, I befriended the German High Command and was thus able to help the Dutch Underground Movement as well as the Allied Forces with vital information. So, when the events of March 1971 started with tanks of the Pakistani forces rolling into Dhaka, I was reliving my experience of my younger days in Europe. I could fully appreciate and understand the predicament of the Bengali people and this motivated me to spring into action on their behalf,"

একাত্তরের প্রথম দিকে ঔডারল্যান্ড ঢাকার অদূরে টংগীস্থ বাটা সু কোম্পানি (পাকিস্তান) লিঃ-এর ব্যবস্থাপন পরিচালক পদে যোগ দেন। ২৫ মার্চ এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও নৃশংস বর্বরতা ঔডারল্যান্ডর হৃদয় আলোড়িত করে ফেলে। ৫৪ বছরের প্রতিবাদী ঔডারল্যান্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেললেন—ফিরে গেলেন তার ইউরোপের যৌবনে। মনস্থির করলেন পাকিস্তানিদের এই গণহত্যা সম্পর্কে বিশ্বকে অবগত করবেন। লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি তুলতে লাগলেন পাকিস্তানি পশুদের হত্যাযজ্ঞের। সে ছবি তিনি পাঠাতে লাগলেন পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রিকায়। ক্যামেরার লেন্স এবং সদাজাগ্রত তার দুই নেত্রের প্রত্যক্ষদর্শিতা ঔডারল্যান্ডকে আরো ক্ষিপ্র করে তোলে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন করবার।

বাটা সু কোম্পানি (পাকিস্তান) লি.-এর মতো একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রশাসনকি কর্মকর্তা (CEO) হিসেবে ঔডারল্যান্ডের পূর্ব পাকিস্তানে অবাধে যাতায়াতের সুযোগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এবারো তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নীতিনির্ধারক মহলে অনুপ্রবেশ করার। ঢাকা সেনানিবাসের ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল সুলতান নেওয়াজের সঙ্গে প্রথম গ'ড়ে তুললেন অন্তরঙ্গ সখ্য। সেই সূত্রে শুরু হয় তার ঢাকা সেনানিবাসে অবাধ যাতায়াত। পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ হতে লাগলেন আরো বেশি সংখ্যক সিনিয়র সেনা অফিসারদের সঙ্গে। কমান্ডো ঔডারল্যান্ড তার উদ্দেশ্যে

১. POW : Prisioner of War

ছিলেন অবিচল। এর পর্যায়ে গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান, পূর্বাঞ্চলীয় কামান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজী, এডভাইজার সিভিল এফেয়ার্স মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী, কমান্ডার ৫৭ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড, ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবসহ অসংখ্য সিনিয়র সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার হৃদ্যতা গ'ড়ে ওঠে। নিয়াজীর ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার তাকে 'সম্মানিত অতিথি' (Distinguished Guest) হিসেবে সম্মানিত করে। এই সুযোগে তিনি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে সব ধরনের 'নিরাপত্তা ছাড়পত্র' সংগ্রহ করেন। ২৪ ঘণ্টার কারফিউ পাশ, যে কোনো সময় সেনানিবাসে প্রবেশ করার এবং বিভিন্ন সদর দপ্তরে যাবার অনুমতি—সব তিনি সহজে জোগাড় করে ফেলেন। যত্রতত্র অবাধ বিচরণে তার আর কোনো বাধাই রইল না। এক পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানিদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা শুরু করেন। একজন চৌকশ গোয়েন্দার মতো সংগৃহীত সংবাদ তিনি প্রেরণ করতেন ২ নম্বর সেক্টরের ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দার এবং জেড ফোর্সের কমান্ডার লে. কর্নেল জিয়াউর রহমানের কাছে।

পাকিস্তানিদের বর্বর নির্যাতন এবং বাঙালিদের অসহনীয় দুর্ভোগ ঔডারল্যান্ডকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি এবার সিদ্ধান্ত নেন প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার। চিঠিতে তিনি লেখেন : "Deeply touched and moved by the almost unbearable sufferings and atrocities I witnessed of the cruel and oppressive force, I secretly, began a guerrilla movement with the brave Bengalis at Bata Tongi and all around Sectors 1 and 2. In addition and as an expatriate CEO of an international Company, I had the company of the occupying Pakistani High Command. This enabled me to help the Bengali freedom fighters. I trained and worked with in relation to their guerrilla activities. All these actions were taken as a result of my deep love and affection I felt for the Bengali people,"

টংগীস্থ বাটা সু ফ্যাক্টরির ভেতরেই তিনি গণযোদ্ধাদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। কমান্ডো হিসেবে ঔডারল্যান্ড অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। এক পর্যায়ে তিনি মাঠে নামেন নিজের জীবন বিপন্ন করে। গণযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি টংগী-ভৈরব রেল লাইনের ব্রিজ, কালভার্ট ধ্বংস করে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিপর্যস্ত করতে থাকেন। তাঁর পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় সংঘটিত হয় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বহু অপারেশন। মেজর হায়দারের দেয়া এক সনদপত্রের সূত্রে জানা যায় যে, ঔডারল্যান্ড মুক্তিযুদ্ধে গণযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, নগদ অর্থ, চিকিৎসা সামগ্রী, গরম কাপড় এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন।

AMARBOI.COM

ঔডারল্যান্ডই একমাত্র বিদেশী, যিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার তাকে তার বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ঔডারল্যান্ড বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ কর্নেল ওসমানীর সাথেও যোগাযোগ রাখতেন। জানা যায়, তখন ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান ডেপুটি হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে গোপনে সহযোগিতা করতেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় ঔডারল্যান্ডের নাম ২ নম্বর সেক্টরের গণবাহিনীর তালিকায় ক্রমিক নম্বর ৩১৭। ঔডারল্যান্ড নামের শেষে 'বীর প্রতীক' লেখেন আজো।

১৯৭৮ সালে বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি. থেকে অবসরগ্রহণ করে ঔডারল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত যান। সেখানে তিনি একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কোম্পানি এক্সিকিউটিভ হিসেবে কিছুকাল চাকরি করেন। ১৯৯৮ সালের ৭ মার্চ সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে ডব্লিউএএস ঔডারল্যান্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতদিনে ঔডারল্যান্ডের শরীর বিদ্রোহ শুরু করেছে। টেলিফোনে তিনি জানান যে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত এ মহতী অনুষ্ঠানে আসতে না পারার জন্য। তিনি অসুস্থ; তিনি হাসপাতালের বিছানায় শায়িত। দৃষ্টিশক্তি প্রতারণা করছে, প্রায় অন্ধ। ডায়াবেটিস এবং ব্যর্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত। সর্বোপরি মৃত্যুরোগ ক্যান্সার তাকে জড়িয়ে ফেলেছে। ঔডারল্যান্ড জানিয়েছেন তিনি একটু সুস্থ হলেই জীবনের শেষবারের মতো বাংলাদেশ আসবেন। 'বীর প্রতীক' পদকের সম্মানী দশ হাজার টাকা তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানবতার জন্য, একটি জাতির মুক্তির জন্য একজন বিদেশীর নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করার এমন দৃষ্টান্ত থাকলেও তা বরাবরই বিরল। ঔডারল্যান্ড তেমনই এক বিরল ও মহানুভব ব্যক্তিত্ব।

দুই : মেঘ সিং

লে. কর্নেল মেঘ সিং। ভারতীয় ১৮ বিএসএফ-এর কমান্ডিং অফিসার। রাজপুত এ সৈনিক একজন কমান্ডো। একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে এ ব্যাটালিয়নটিকে তড়িঘড়ি করে রাজস্থান থেকে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে পেট্রাপোল এলাকায় আনা হয়েছে। ছ'ফুট উচ্চতার মেঘ সিং একজন স্মার্ট, সদাহাস্য ও দিলদরিয়া মানুষ। মেঘ সিংয়ের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য 'বীর চক্র' পদক লাভ করেন। সিনিয়রদের মুখের ওপর অপ্রিয় সত্য কথা বলার অভ্যাস ছাড়তে না পারায় এ দুঃসাহসী অফিসার পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অনেক দিন আগেই। একাত্তরের ৩০ মার্চ যশোর সেনানিবাসে ১ম

AMARBOI.COM

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর আক্রমণ চালানো হলে মাত্র ২০০ সৈনিক নিয়ে লে. হাফিজ এবং সেকেন্ড লে. আনোয়ার যুদ্ধ করতে করতে রাতে ঝিনাইদহের পথে সেনানিবাস ত্যাগ করেন। পশ্চাদপসারণকালে ঐদিনই সেকেন্ড লে. আনোয়ার বীরত্বের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হন। লে. হাফিজ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ দ্বারা ক্রমশ শত্রুর শক্তিক্ষয় করে চলেছেন। ১৪ এপ্রিল চৌগাছা ছেড়ে এসে যশোর-বেনাপোল গ্র্যান্ড ট্রাংক সড়কের কাগজপুকুর এলাকায় ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২০০ (১০০ সৈনিক ইতিমধ্যেই শহীদ বা আহত হয়েছে) এবং ইপিআর-এর ৩০০ সৈনিক নিয়ে লে. হাফিজ প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। ২৩ এপ্রিল। পুবের আকাশ ফর্সা হতে কেবল শুরু করেছে। পাকিস্তানিদের প্রচণ্ড এবং অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু হলো কাগজপুকুর প্রতিরক্ষা এলাকায়। ইপিআর-এর কোম্পানি দুটির অবস্থান সামনে। এদের কনভেনশনাল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। হতাহতের সংখ্যা বাড়লেও পাকিস্তানি আক্রমণ এরা অত্যন্ত দক্ষতা ও বীরত্বের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছে। হাফিজ কোম্পানি দুটিকে পিছিয়ে এনে বেনাপোল চেকপোস্ট এলাকায় সন্নিবেশিত করলেন। যুদ্ধ অব্যাহত, আর্টিলারি শেলিং এবং অনবরত গুলি চলছে। এরই মধ্যে পেছন দিক থেকে জিপ চালিয়ে হাফিজের অবস্থানে এলেন কর্নেল মেঘ সিং। এত গোলাবর্ষণের মধ্যেও ধীর-স্থির। চেহারায় কোনো উদ্বেগের ছাপ নেই। পাকা সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, "হাফিজ ঠিক আছো তো?" কেবলমাত্র সাহস জোগানোর জন্যই মেঘ সিংয়ের এই যুদ্ধক্ষেত্রে আসা। আহতদের পেছনে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এবং ফিরে গিয়েই ক্যাপ্টেন ভার্মাকে দিয়ে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিলেন ৬টি ৩ ইঞ্চি মর্টার, যথেষ্ট গোলা এবং দুটি পোর্টেবল বেতারযন্ত্র। কূটনীতি এবং ভারতীয় সামরিক স্ট্র্যাটেজির বাইরেও এক মেঘ সিং ক্রমশই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মিকভাবে একাত্ম হয়ে যেতে লাগলেন। ১৭ এপ্রিল বৈদ্যনাথতলায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মেঘ সিং প্রথম সারিতে বসা—মেজর ওসমান, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ-এর সঙ্গে। মে মাসের মাঝামাঝি কোনো একদিন হাফিজ গিয়েছে পেট্রাপোলে মেঘ সিংয়ের হেডকোয়ার্টারে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করতে। মেঘ সিং অন্যমনস্ক। মুখ খুললেন ক্ষুব্ধভাবে। ভারত সরকার কেন আরো সক্রিয়ভাবে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছে না, তাই তিনি ক্রুদ্ধ। একদিন তিনি হাফিজকে জানালেন, তার খুব ইচ্ছা বিএসএফ-এর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মুক্তিবাহিনীর একজন সৈনিক হয়ে লড়বেন। কিছুদিন পর ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল অরোরা এলেন পেট্রাপোল এলাকায়। সাথে তার চিফ অফ স্টাফ মে. জেনারেল জ্যাকব ও নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল দলবীর সিং। ক্যাপ্টেন হাফিজের সাথে কথা বলছেন। এমন সময় স্মার্ট ইউনিফর্ম পরিহিত লে. কর্নেল মেঘ সিং এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। স্যালুট করে ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে উড্ডীয়মান বাংলাদেশের পতাকাটি দেখিয়ে ইংরেজিতে জেনারেল অরোরাকে বললেন, "স্যার, আমি

AMARBOI.COM

মুক্তিবাহিনীর এই অফিসারটিকে কথা দিয়েছি যে এই পতাকাটি কেবল আমার মৃতদেহের ওপর দিয়েই নামানো সম্ভব (This flag will come down only over my deadbody)। আমি চাকরি ছেড়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

সবাই হতভম্ব! জেনারেল অরোরা চমকে উঠেও সামলে নিলেন নিজেকে। এই ক্ষ্যাপা সৈনিকটিকে আরোরা আগে থেকেই চিনতেন। মেঘ সিংয়ের ইচ্ছাপূরণ হয়নি। তবুও প্রৌঢ় এ সৈনিকটি, যিনি আমাদেরই একজন—স্বীকার্য হয়ে ওঠেন।

তিন : অসমাপ্ত উপসংহার

'ঔডারল্যান্ড হাউজ'। ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন ভবনটির নাম। বাংলাদেশ সরকার অস্ট্রেলীয় সরকারকে ঔডারল্যান্ডের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ এ জমি ও ভবনটি উপহার দিয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ ঔডারল্যান্ডকে ইনটেনসিভ মেডিকেল কেয়ারে ক'দিনের জন্য আনা হয়েছে ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে। রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা দেয়া হবে এ বীর সৈনিককে, বাংলাদেশকে যিনি নিজের চাইতেও বেশি ভালবেসেছিলেন। মেঘ সিংও এসেছেন একই প্রণোদনায়। বৃদ্ধ ঔডারল্যান্ডের কপোল বেয়ে মুক্তার মতো অশ্রু টলটল করছে। বৃদ্ধের চোখের পানি বড় আনন্দের, বড়ই বেদনার।

এই উপসংহারের পুরোটাই কল্পনা। সব কল্পনাই যে সত্যি হবে এমনও তো কোনো কথা নেই।

মিরাশের মা এবং মদন থানার দুরন্ত ছেলেরা

যে দু'টো কোম্পানি মদন থানা এলাকায় ছিল তারা কোম্পানি উপ-অধিনায়ক আবদুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে ১২ জন ছেলে রেখে মদন ছেড়ে চলে যায়। উইং উপ-অধিনায়ক আবদুস সালাম এবং কোম্পানি কমান্ডার মখতুল হোসেন এক কোম্পানি নিয়ে ২৪ আগস্ট রাতে চলে যায় তাড়াইল এবং ২৬ আগস্ট উইং কমান্ডার কাজী সামসুল আলম এবং কোম্পানি কমান্ডার সামসুল আলম (দুই পৃথক ব্যক্তি) আরেক কোম্পানি নিয়ে চলে যায় মোহনগঞ্জ। ঐ দিন কুদ্দুস তার ছেলেদের নিয়ে থানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে (TTDC) মদন ফনায় চলে আসে। বাজার সংলগ্ন খেয়াঘাটে একটি এলএমজি ট্রেঞ্চ এবং গ্রামবাসীকে নিয়ে নদীর পূর্বপাড়ে আরো কয়েকটি রাইফেল ট্রেঞ্চ খোঁড়া হলো। এ যাবৎ পাকিস্তানিরা মদন আসেনি। তবে আসার আশঙ্কা যে কোনো দিন।

২৮ আগস্ট খুব ভোরে খবর পাওয়া গেল পাকবাহিনী মদন আসছে। কুদ্দুসদের মোটামুটি বেহাল অবস্থা। ১৩ জনের শক্তি দিয়ে পাকিস্তানিদের আটকানো যাবে কীভাবে। তবে শত্রুকে ওয়াক ওভার দেয়া যাবে না কোনোভাবেই। কুদ্দুস, এখলাস, আলী আকবর এবং সৈয়দ আহমদ ১টা এলএমজি এবং ৩টা এসএলআর নিয়ে অগ্রগামী শত্রুকে ত্বরিত এম্বুশ করার পরিকল্পনা করে ফেলল। মদন-নেত্রকোণা সড়কে মাইল দুই পশ্চিমে বয়রাখলা নদীর পূর্ব পাড়ে তারা পৌঁছে সকাল সাড়ে আটটার দিকে। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে অবস্থান নিয়ে তারা অপেক্ষা করতে থাকে শত্রুর জন্য। পেছনে মদন বাজারের খেয়াঘাট এলএমজি পোস্টে এলএমজি নিয়ে আছে আবদুল খালেক এবং সাথে ফজলুল হক। থানায় অবস্থানে আছে আবদুস সোবহানের নেতৃত্বে গাজী, আইয়ুব আলী, মিরাশের মা এবং রমজান আলী।

জজের মা, পুলিশের মা, উকিলের মা, সাহেবের মা, মাস্টারের মা, দারোগার মা-এ অঞ্চলে মেয়েদের এমন নাম রাখা হয়। এ মেয়েদের বিয়ের পর তাদের ছেলে জজ, দারোগা, মাস্টার হবে—এমন একটা আশা পোষণ করা, নাকি নিতান্তই কল্পনায় বড় করে দ্যাখা। এর নৈর্ব্যক্তিক কোনো ব্যাখ্যা কেউই দিতে পারে না। আমাদের মিরাশের মার নামটাও এই ধারার। আর দশজন গাঁয়ের বৌ-এর মতো মিরাশের মা'ও খেটে খাওয়া মানুষ। একটা ছেলে, কোলের কাছে জমি জিরাত না থাকলে যা হয়। স্বামী কামলা দেয়। থাকার মধ্যে নিজের আছে ওই কোলের একটা

AMARBOI.COM

ছেলে এবং একটা দোচালা ঘরের ভিটে। মদন থানার পূর্ব দিকে এই কাছেই তার বাড়ি। মুক্তিযোদ্ধারা যখন মদন এলো, মিরাশের মা তখন থেকেই তাদের সাথে। মেয়ের বয়স তখনো তিরিশ ছোঁয়নি, তারপরও সব ছেলেরা তাকে ডাকে খালা। স্বামী, সন্তান কোথায় গেল মিরাশের মার, দিন-রাত এদের খাবার রান্না করছে, এদের দেখাশোনা করছে। কিন্তু সে এ পর্যন্তই এসে শেষ করতে চায়নি। তার যেতে হবে বহু দূর। আস্তে আস্তে মুক্তিযোদ্ধাদের সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার রপ্ত করে ফেলল। শহরের মেয়েরা তখন শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে গ্রামে, পাকিস্তানি পশুদের থেকে ঠাঁই খুঁজছে দূরে, মিরাশের মা গ্রাম ছেড়ে এসেছে মাঠে, পশুদের থেকে পালিয়ে নয়—মোকাবেলা করার জন্য তৈরি হয়েছে সে।

বিকাল তিনটার দিকে খবর এলো—শত্রু নেত্রকোণা থেকে নয়, কেন্দুয়া থেকে কেন্দুয়া-মদন রাস্তা দিয়ে আসছে। আরো বিভ্রান্তি ভর করল কুদ্দুসদের ওপর। নিশ্চিত হবার জন্য এখলাসকে পাঠানো হয় রেকি ক'রে সত্যতা যাচাই করতে। কিছু সাঁতরিয়ে, কিছু পথ পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে কেন্দুয়া-মদন রাস্তার কাছে পৌঁছে এখলাস দেখে শত্রু বয়রাখলা নদী পার হচ্ছে। তখন চারটার মতো বাজে। আবারো তার প্রাণপণে ছোটা। কিছুক্ষণ পরে স্কুলের (জাহাঙ্গীরপুর টি আমিন উচ্চ বিদ্যালয়) দিক থেকে অটোমেটিক হাতিয়ারের মুহুর্মুহু বার্স্ট শোনা গেল।

শত্রু বিনা বাধায় কেন্দুয়া এলাকায় পৌঁছে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই গিয়েছিল যে ওখানে মুক্তিবাহিনী নেই। বড় বড় দু'টি খেয়া নৌকা ক'রে তারা আনুমানিক ৩৫/৪০ জন মগরা নদী পার হবার জন্য নৌকা ভাসায়। খালেক তার এলএমজি নিয়ে ফজলুসহ এতক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করছিল। শত্রু বোঝাই খেয়া নৌকা দু'টি নদীর মাঝখানে আসলে খালেকের নিকট থেকে শত্রুর দূরত্ব হয় ৭৫/১০০ গজ। মদন থানার যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিল খালেক তার সখের হাতিয়ারটি দিয়ে। কুদ্দুসদের কিছুক্ষণ আগে শোনা অটোমেটিক হাতিয়ারের গুলির শব্দ খালেকেরই এই এলএমজি-র গর্জন। উপর্যুপরি এলএমজি-র বার্স্টে নৌকা দু'টি ডুবে গেল। মারা গেল সব পাকসেনা। মুহূর্তের মধ্যে মগরা নদীতে লাল পানি বইতে শুরু করল। ওদিকে সোবহান, গাজী, মিরাশের মা, রমজান, আইয়ুব আলী তাদের ট্রেঞ্চ থেকে শত্রুর ওপর কার্যকরী ফায়ার আনছে। আটকে গেল পাকসেনাদের অগ্রাভিযান। দুরন্ত ক'জন ছেলে আর আমাদের মিরাশের মা দেখিয়ে দিল—তারাও পারে এবং ভালোভাবেই পারে। শত্রু এরপর আর সেদিন মগরা নদী পার হতে চেষ্টা করেনি। কুদ্দুস, এখলাস, আকবর আর সৈয়দ আহমদের মগরার ওপারের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ নয়। ছুটিতে আসা মাহবুব আলম কোম্পানির তিন মুক্তিযোদ্ধা গোলাম আহমেদ, ইদ্রিস আলী ও ক্ষীতেন্দ্র বৈশ্য গোলাগুলির শব্দ শুনে কুদ্দুসদের সাথে যোগ দেয়। এদের দল ভারি হলো ৭ জনে। শত্রু অবস্থা রেকি করার জন্য সন্ধ্যার পর জাহাঙ্গীরপুর স্কুল এলাকা ঘুরে দেখে পাকিস্তানিরা মার

AMARBOI.COM

খেয়ে স্কুলের মাঠে জড়ো হয়েছে। অবস্থা বিপর্যস্ত। মাঠটি সাধারণ এলাকা থেকে নিচু। দক্ষিণে ও পূবে উঁচু রাস্তা। মোক্ষম টারগেট। এরা সুবিধাজনক একটা জায়গা খুঁজে নিলো মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শত্রুর অবস্থানের একশ গজের মধ্যে। মুক্তিবাহিনী মগরা নদীর ওপারে, নিশ্চিত হয়ে পাকসেনারা মাঠে গা এলিয়ে দিয়েছে। হঠাৎই গর্জে উঠল এক সাথে সব হাতিয়ার। এলএমজি-র স্বয়ংক্রিয় গুলির মুখে শত্রুর দিশেহারা অবস্থা। অসংখ্য পাকসেনা নিহত ও আহত হয়ে মাঠে পড়ে রইল। বাকিরা কোনোভাবে দৌড়ে স্কুলঘরে গিয়ে নিজেদের রক্ষা করল। এমনই অপ্রস্তুত অবস্থায় এদের আক্রমণ করা হয়েছে যে, পাল্টা ফায়ার করার পর্যন্ত এদের সুযোগ হয়নি। এই সাত অদম্য সাহসী ছেলে সুযোগ বুঝে এখানে আর অপেক্ষা না করে পশ্চাদপসরণ করল। এখানে কভারও নেই কোনো। তারপর উত্তরে বয়রা নদী দিয়ে গণেশের হাওর পার হয়ে মধুখালী খাল দিয়ে মগরা নদীতে পড়ে। দীর্ঘ সময় এবং লম্বা পথ ঘুরে এরা মদন থানার পূর্ব দিকে প্রায় এক মাইল দূরে মদন-খালিয়াজুরি রাস্তার পাশে কুলিআটি গ্রামে এসে ওঠে। তখন ভোর হচ্ছে (২৯ আগস্ট), এদিকে থানা এলাকার যুদ্ধে গোলাগুলি মাঝরাত থেকে বন্ধ। এই সাতজন মদন গ্রামের ভেতর দিয়ে থানা এলাকায় পৌঁছে। শত্রু নদীর ওপারে মাহমুদপুর গ্রামে হাঁটাহাঁটি করছে। এদের দেখেই লক্ষ্যহীনভাবে গুলি করল। এরা দক্ষিণে এসে রাজঘাট এলাকায় উঁচু আইলের পেছনে অবস্থান নেয়। আইল একটু বেশি উঁচু হওয়াতে খুরপি দিয়ে কেটে আইলের উচ্চতা কমাতে হলো। নিজকে রোপা আমন ধানের নিচে লুকিয়ে কাদার মধ্যে শুয়ে ফায়ার করেছে খালেক সারারাত। এখলাসরা গিয়ে আবিষ্কার করে খালেকের শরীর সাদা হয়ে অসাড় পড়ে আছে। নড়তে পারছে না, কথাও বলতে পারছে না। খালেককে তুলে মদন পশ্চিম পাড়ায় নায়েব আলীর বাড়িতে আনা হয়। এমন সময় সোবহান, মিরাশের মা, আইয়ুব এবং রমজান এসে যোগ দেয়। দুই/তিন জন গ্রামের লোক এসে আগুন জ্বালিয়ে তাপ দিয়ে খালেককে একটু সতেজ করে।

সবাই এখন তাদের ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আরো যুদ্ধোপযোগী করায় ব্যস্ত। নদীর ওপার এইতো একশ গজ বা একটু বেশি। এমন সময় শত্রু রাজঘাটের বিপরীত দিকে এসে জড়ো হলো। একটা নৌকা বাঁধন ছাড়া নদীর মধ্যে ভাসছিল। শত্রু একটা ইট দড়ি দিয়ে বেঁধে নৌকাটির ওপর ফেলে। তারপর আস্তে আস্তে দড়ি টেনে নৌকাটি পাড়ে ভেড়ায়। তারপর ১২/১৩ জন পাকসেনা নৌকায় ওঠে। এদের একজনের মাথায় হেলমেট নেই, লাল ব্যারেট ক্যাপ। হাতে অস্ত্র নেই, ছোট লাঠি (ব্যাটন)। অর্ধেক নদী আসতেই কুদ্দুস এলএমজি দিয়ে ব্রাশ করে। সাথে সাথেই সব অস্ত্র গর্জে ওঠে। সব পাকসেনা মারা যায়। নৌকাটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে খণ্ড খণ্ড কাঠ নদীতে ভাসতে থাকে। পাকিস্তানিরা নদী পার হওয়ার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল। এদিকে দুইদিন কারো পেটে কিছুই পড়েনি। দুইদিন আগে সোবহানের বাড়ি থেকে মেড়া পিঠা আনা হয়েছিল। সেগুলো থানায় আছে। মিরাশের মা তার

AMARBOI.COM

এসএমসি সোবহানের কাছে দিয়ে সাইড রোল করে থানায় গিয়ে একটা ছোট তোয়ালে ক'রে কিছু পিঠা এনে সোবহানের হাতে দেয়। সোবহান পিঠার পোটলাটি এক হাতে উঁচু করে ধরে সাইড রোল করে যেতে থাকে সবাইকে পিঠা দেবার জন্য। এমন সময় হঠাৎ একটি গুলির বার্স্ট এসে পিঠার পোটলাটি উড়িয়ে নিয়ে যায়। দুপুর দেড়টার দিকে একটা হেলিকপ্টার খুব নিচু দিয়ে উড়ে এলো। কয়েকবার ঘুরে ঘুরে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান বের করার চেষ্টা করল। তারপর হেলিকপ্টার থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করা শুরু হলো। হেলিকপ্টার এত নিচু দিয়ে উড়ছিল যে, হেলিকপ্টারের লোকজন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ছেলেরা গুলি করলেও হেলিকপ্টারে লাগাতে পারেনি। হাত দিয়ে ওপর থেকে গ্রেনেড ফেলা হচ্ছিল। এ আক্রমণে কেউ হতাহত হয়নি। প্রায় পনেরো মিনিট আক্রমণের পর এটি স্কুলের মাঠে নামে। হেলিকপ্টার থেকে অনেক পাকসেনা অবতরণ করে এবং বহু মৃতদেহ এবং আহত সৈন্য তোলা হয়।

দুপুরের দিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। এদিকে এক মজার ঘটনা ঘটে গেল। আইয়ুব আলী একটা কড়ই গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুর ওপর ফায়ার করছিল। এখলাস চেঁচিয়ে তাকে বলল পজিশনে যেতে। আইয়ুব উত্তর দিল যে, ওই শত্রুটা না মেরে সে পজিশনে যাবে না। নদীর ওপারে এক পাকসেনা পাটকাঠির ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে একইভাবে আইয়ুবের দিকে ফায়ার করছিল। যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ। আইয়ুব হাসছে আর গুলি করছে। ফাঁকে এখলাসের সাথে কথা বলছে, যেন একটা খেলা। মৃত্যু নিয়েও যেন খেলা করা যায়। এবার আইয়ুবের গুলিতে পাকসেনাটি লুটিয়ে পড়ল। এবং আইয়ুবের খোলা মুখ দিয়ে শত্রুর একটি গুলি ঢুকে ডান গালের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়। দুইজন আহত আইয়ুব আলীকে পেছন নিয়ে যায়। এদিকে এদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান রজমান আলী পজিশন নিতে গেলে তার তলপেটে একটি খুঁটি ঢুকে যায়। তাকেও পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়। লোকবল কমে যায়। প্রতিরক্ষায় রইল কুদ্দুস, মিরাশের মা, এখলাস এবং সোবহান। ফাঁকে এখলাস ও কুদ্দুস পিঠা খাবার জন্য একটা নিচু এলাকায় বসল। এমন সময় কুদ্দুসের বাম কোমরের নিচে (Hip Joint) একটা গুলি লাগে। এখলাস লক্ষ্যই করেনি। হাড়, মাংস ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। মদন গ্রামের আবদুল জাহেদ তালুকদার চাল ভাজা নিয়ে আসছিল এদের জন্য। তার ঘাড়ে গুলি লাগে। কুদ্দুস কাঁদতে থাকে। বলে, 'আমি শেষ। আমার মায়েরে তোমরা দেখো।' খালিয়াজুরির পথে মাইল পাঁচেক দূরে গোবিন্দশ্রী বাজারে নিয়ে যাওয়া হয় কুদ্দুসকে। চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়। কুদ্দুস মারা যায়। এ গ্রামের কবরস্থানেই কুদ্দুসকে সমাহিত করা হয়। মদনের প্রথম যুদ্ধ এ দু'দিনের।

এগার নম্বর সেক্টরের এ এলাকার চলাচল পথ ছিল ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা হয়ে সুনামগঞ্জের ধরমপাশা, মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরী। এ চলাচল পথ বন্ধ

AMARBOI.COM

করতেই খুব সম্ভবত পাকিস্তানিরা মদন ও খালিয়াজুরীকে নিজেদের দখলে আনতে চেয়েছিল। তাছাড়া এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর কোনো রণকৌশলগত গুরুত্ব থাকার কথা নয়। মদনের দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয় ৩১ অক্টোবর। এটি অপেক্ষকৃত পরিকল্পিত যুদ্ধ। চারটি দলে আমাদের যোদ্ধারা ভাগ হয়ে শত্রুকে মদন থানায় অবরুদ্ধ করে ফেলে। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ চলে। ৪ নভেম্বর নজরুল কোম্পানির আবদুল মতিন খন্দকার ২৫/২৬ জন যোদ্ধা নিয়ে দক্ষিণ দিকের দলের সাথে যোগ দেয়। ৫ নভেম্বর রাতে জহিরুল হক হীরা মাহবুব আলম কোম্পানির ১০/১২ জন ছেলে নিয়ে পশ্চিমের দলের সাথে যোগ দেয়। পাকিস্তানিরা সহায়হীন এবং অকার্যকর হয়ে পড়ে। ধারণা করা হয়—ওরা ওয়্যারলেসে সাহায্য চায়। নীতিনির্ধারকরা মদনের প্রচণ্ড ক্ষতির পর সেখান থেকে শত্রুর উপস্থিতি তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ৬ নভেম্বর কেন্দুয়া থেকে ৭০/৮০ জনের শত্রুর একটি দল মদন আসে। এদিকটা ছিল অরক্ষিত। মদনের পাকসেনারা পশ্চাদপসরণের জন্য তৈরি ছিল। ৭ নভেম্বর খুব ভোরে দক্ষিণ দিক দিয়ে এরা সবাই পশ্চাদপসরণ ক'রে কেন্দুয়া চলে যায়। মুক্ত হয় মদন। দুরন্ত ছেলেরা দুর্নিবার যুদ্ধে পরাজিত করে পাকিস্তানিদের। মদনের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ পাকিস্তানিদের কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বের ক'রে মগরা নদীতে ফেলে দেয়। ৪১টি মৃতদেহ ফেলেছে তারা। তারা বলেছে, 'জীবিত কিংবা কোনো মৃত পাকিস্তানি রাখব না আমরা মদনে।' মোট ৮২টি পাকা বাংকার থেকে আরো মৃতদেহ বের করা হয়। এ যুদ্ধে নিজেদের কেউ মারা যায়নি। রঞ্জিত কুমার সরকারের পশ্চাতে গুলি লাগে। সোবহানের সামনে পড়ে একটা স্মোক শেল। ধোঁয়ায় সোবহান অজ্ঞান হয়ে যায়। ফুসফুসের ক্ষতি হয় মারাত্মক। এ ক্ষতের কারণে স্বাধীনতার পর মৃত্যু হয় সোবহানের।

মিরাশের মার কিছুই হয়নি। স্বামী সন্তান কোথায় হারিয়ে গেল। ভিটেটাও বিক্রি ক'রে গ্রামছাড়া হয়েছে। মিরাশের মা'ও এখন স্বাধীন। লোকে বলে, পাগলী ফকির হয়ে গেছে। বছরে এক দুইবার নেত্রকোণা আসে। এখলাসদের খুঁজে বের করে গালাগালি করে অকথ্য ভাষায়। তারপর আবারো নেই ক'মাসের জন্য। বেঁচে আছে অন্যের দয়া আর দাক্ষিণ্যে।

কত আঘাত পেলে এ জাতি কষ্ট পাবে? যথেষ্ট বোধহয় এখনো হয়নি।

AMARBOI.COM

খণ্ডচিত্র একাত্তর

উদ্দেশ্য সৃষ্টি হলেও যুদ্ধ বৈশিষ্ট্যগতভাবে সবসময়ই বিনাশী। যুদ্ধ প্রক্রিয়া শুধু হত্যা আর ধ্বংসের আবহে ক্রিয়াশীল। শত্রুর প্রাণসংহারেই আনন্দ এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর করতে পারাই জয়। তারপরও কোনো যুদ্ধই কেবলমাত্র সশস্ত্র বৈরিপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তার রূঢ় প্রভাব জনগণের ওপর পড়েছে বাধ্যবাধকভাবে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের জনগণের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেয়া যেন তার পক্ষের বাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে নিতে না পারে। যুদ্ধের তাণ্ডব শিশু, বৃদ্ধ, নারী, রুগ্ন কাউকেই ছাড় দেয় না—জেনেভা কনভেনশন তা যাই-ই বলুক না কেন।

একাত্তর এ জাতির সবচেয়ে স্মরণীয় সময়—বেশিটাই গর্বের, যদিও গ্লানির অংশও একেবারে কম নয়। মার্চ-ডিসেম্বর সময়টা এ জাতির পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক কাল। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলে আলম নীলফামারীর ছাতনাই বালাপাড়ার যুদ্ধে হাতে, কোমরে আটটি গুলিতে আহত হলো। ভুরুঙ্গামারীর গেরস্থের কামলা ছেলে খালেক হাতিবান্ধার যুদ্ধে শত্রুর অপ্রতিরোধ্য মেশিনগান পোস্টে গ্রেনেড ছুঁড়ে তা স্তব্ধ করে দিলেও নিজে মারাত্মক আহত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা পড়ল এবং অমানুষিক নির্যাতনের পর নিহত হলো। তিরিশের কোঠার মদনের সলাজ চাহনি। মিরাশের মা'র রক্তে স্বাধীনতার বান বইল—পাঁচজন সতীর্থ যোদ্ধার সাথে এক কোম্পানি শত্রুর অগ্রাভিযান এবং নদী অতিক্রম ঠেকিয়ে দিল—পাল্টে গেল মগরা নদীর পানির রং—শত্রুর রক্তে লাল পানি বইল মগরায়। অন্যদিকে বহু বিদ্বান ব্যক্তি এ যুদ্ধে মাঠে নামতে পারেননি। পারেননি কারণ—এটা বিদ্যা ও বুদ্ধির যুদ্ধ ছিল না। এ যুদ্ধ ছিল নিরেট দেশপ্রেম, বাধভাঙা সাহস আর সুতীব্র আবেগের এক কঠিন সংমিশ্রণ। কলমের কাজ অস্ত্র দিয়ে হয় না। তেমনি তার উল্টোটাও সত্য। আর যখন এই রক্তের ডাক এলো তখন যুক্তি দেয়া হলো—সবাই যদি বন্দুক হাতে যুদ্ধে যাবে, তবে এই বৃহত্তর সংগ্রামের মেধার জোগান আসবে কোথেকে। শেষমেশ বন্দুক হাতে নেবার দায়িত্ব পড়ল এই আমজনতার ওপর। এরা অসাধারণভাবে সাধারণ। জনযুদ্ধের এরাই নায়ক—এরাই সেই গণযোদ্ধা।

ন'মাসের এই জনযুদ্ধের খণ্ডিত কিছু বিস্মৃত চিত্র এখানে উপস্থাপিত হলো। এই ঘটনাগুলোর তেমন কোনো তাৎপর্য নেই কিংবা হয়তোবা আছে। পুরোটাই বোধের বিষয়। একাত্তরের একরকম বীক্ষণ এই খণ্ডচিত্র।

AMARBOI.COM

এক.

একাত্তরের আগস্ট মাস। সারাদেশে যুদ্ধ চলছে। শ্রাবণের রাতে প্রশিক্ষণ শেষে ময়মনসিংহের দুর্গাপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে নেত্রকোণার এক তরুণ, আশরাফ আলী খান খসরু আর তার সহযোদ্ধারা। আঁধারে মোড়ানো গোটা দুর্গাপুর। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। এর মাঝে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। অল্পক্ষণ পরেই শুরু হলো দমকা হাওয়া। ঝড়ো হাওয়ার প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ আটকে দিল ছেলেদের। বৃষ্টির ফোটা হাতে পড়লে ব্যাথা লাগছে। উঁচু গাছগুলি ঘন ঘন নুইয়ে পড়ছে বাতাসে। ভিজে জবুথবু সবাই। কোনোভাবেই পথ চলা সম্ভব নয়। সবাই মিলে কোথাও রাত কাটানোর মতো স্কুল, মাদ্রাসা বা মসজিদও খোঁজাখুঁজিতে পাওয়া গেল না। ছোটছোট ঘর সব ছড়ানো ছিটানো। ঠিক হলো—দুজন করে এক একটি ঘরে রাত কাটাবে। সকালে সবাই আবার নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হবে। হতদরিদ্র এ বসতির কারোর কাছেই যেন খাবার বা বিছানাপত্রের জন্য অনুরোধ করা না হয়—বলা হলো সবাইকে।

খসরু ও তার এক সহযোদ্ধা একটি ছোট্ট ঘরে গিয়ে কড়া নাড়ল। কড়া নাড়ার শব্দের সাথে সাথেই ঘরের ভেতর থেকে শোনা গেল এক কিশোরীর কণ্ঠস্বর—'মা, আইছে।' সাথে সাথেই দরজা খুলে গেল। মাঝবয়সী এক মহিলা দুহাতে দরজার দুটি পাল্লা ধরে এদের দিকে বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে আছেন। ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতা। খাবার সাজানো সামনেই। টিমটিমে কুপি জ্বলছে একপাশে। মহিলা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন খসরুদের দিকে। খসরুরাও বিস্মিত। 'বাবারা ভেতরে আইও' বলে মহিলা আগলে রাখা দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন। মাঝখানে বেড়ার ওপাশে ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না মা, হে না।' গায়ের ভেজা কাপড় খুলে একপাশে রাখা হলো। হাতিয়ারগুলো দাঁড়া করে রাখা হলো বেড়ার সাথে। মহিলা খসরুদের মাদুরে বসিয়ে সাজিয়ে রাখা খাবার তুলে দিচ্ছেন। এরা ক্ষুধার তাড়নায় আগ-পাছ না ভেবেই খাওয়া শুরু করে দিল। পরম যত্নে মাতৃসম মহিলা খাওয়াচ্ছেন। খাওয়াতে খাওয়াতে কথা বলছেন। স্বামী হারিয়েছেন তিনি সে বহু বছর। একমাত্র মেয়ে নিয়ে সংসার। যুদ্ধের কিছুদিন আগে এক তরুণ যুবকের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরের ছেলেকে ঘরে আনেন। মেয়ের সুবাদে একটি ছেলেও জুটেছিল তার। দরিদ্র সংসারে সুখ উঁকি দিল। তারপরই শুরু হলো যুদ্ধ। ছেলেটা তার মেয়েকে এবং তাকে বলেকয়েই যুদ্ধে গেছে। বলে গেছে চিন্তা না করতে, যুদ্ধ শেষে সে চলে আসবে। সেই আসার আশায় মেয়েটা প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকে। প্রতিরাতে ভাত বেড়ে সারারাত বসে থাকে। যদি ও আসে, যদি এসে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার না পায়। তাই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মেয়েটা আনন্দিত হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল—ও এসেছে, মা সামনে তাই লজ্জায় মেয়েটি পাশের ঘরে চলে গেছে।

AMARBOI.COM

খসরুদের সেই কখন খাওয়া থেমে গেছে। মহিলার খেয়াল নেই। কথা বলতে বলতে ভুলে গেছেন খাবার তুলে দিতে। ওপাশের এক চিলতে ঘরে আলো নেই। এক কিশোরী মেয়ে আঁধারে বসে মা'র কথা শুনছে। কী জানি হয়তোবা কিছুই শুনছে না। তার বন্ধু এমনি করেই সত্যি সত্যিই এসে চমকে দেবে কোনোদিন। ভাবছে, তার স্বামী হয়তো এমনি করেই কোনো ঘরে মাতৃস্নেহে বসে খাচ্ছে। তার এত আদর আর ভালবাসা ছেড়ে থাকা তো সম্ভব নয়। দেশটা স্বাধীন করা কি এই ভালোবাসার চেয়েও বেশি প্রয়োজনের, বেশি আকর্ষণের? কেন দেশটা স্বাধীন হয় না, কেন ফিরে আসে না সে। উষ্ণ চোখের জলে শাড়ির আঁচলটা হয়তো ভিজে গেছে। ও ঘরে, ও মনে কী হচ্ছে, তা বোঝা মোটেও সহজ নয়। এক কিশোরী বধূর হৃদয় জুড়ে এক তরুণ যোদ্ধা স্বামী। আর এক তরুণ স্বামীর হৃদয়ে গোটা বাংলাদেশ।

দুই.

অক্টোবর মাসের শেষ দিকের কথা। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩৫ জনের একটি প্লাটুন সিলেটের শ্রীমঙ্গল রেল স্টেশনে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প রেইড করার পরিকল্পনা নেয়। দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় রেকি সম্পন্ন হয়েছে। রেইড দলের বিভিন্ন গ্রুপের অধিনায়কদের তাদের অবস্থান এবং কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। সব প্রস্তুতি নেয়া শেষ। এ এলাকাটির চারদিকেই চা বাগান। দূর থেকে দেখলে মনে হবে পুরো এলাকায় মখমলেন সবুজ চাদর বিছানো। মাঝে মাঝে রেইন ট্রি ঝাঁকড়া ডাল মেলে আছে। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। কিন্তু যুদ্ধের কারণে কারোরই সময় নেই, সুযোগ নেই এ দৃশ্য উপভোগ করার। লুকিয়ে থাকা বা গোপনে পথচলার জন্য চা বাগান একটি আদর্শ এলাকা। যুদ্ধের কারণে সব জনশূণ্য। জঙ্গল গজিয়ে গেছে চারদিকে। গোটা চা বাগান এলাকাটি দেখতে প্রায় একই রকম। পথ চলায় সবচেয়ে অসুবিধা বিশেষ করে রাতে। রেইড দলকে পথ দেখিয়ে শত্রু অবস্থানে নিয়ে যাবার জন্য গাইড হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে পাত্রখোলা চা বাগানের কুলি হরিকে। গাইডের প্রয়োজন শুনে সে নিজে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলো। ভালো গাইড পাওয়া কঠিন। তাছাড়া গাইড হিসেবে কাজ করাও খুব ঝুঁকিপূর্ণ। ক'দিন আগে একই ধরনের একটি রেইড দলকে শত্রুর অবস্থানের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় আরেক কুলি গুতনাবের শত্রুর গুলিতে নিহত হয়।

শীর্ণদেহ, কোকড়া চুল আর বোকাসোকা একটা চেহারা হরির। বছর পঁচিশেক হবে বয়স। ঠোঁটে শিশুর একটা হাসি সবসময়ই লেগে আছে। তিন কুলে কেউ নেই ওর। কাছের মানুষ বলতে এক তার কিশোরী স্ত্রী। পঁচিশে মার্চের পর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে এসে এক শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছিল।

AMARBOI.COM

বিকাল বেলা রেইড দল যাত্রা শুরু করে। সাথে নেয়া হয়েছে দু'টি ৩ ইঞ্চি মর্টার। দলে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য রয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের শেষবর্ষের ছাত্র মুজিবর রহমান ফকির। সীমান্তের কাছাকাছি আসতেই খবর এলো—হরির আসন্নপ্রসবা স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার মুজিবকে সঙ্গে দিয়ে হরিকে তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ঘণ্টাখানিক পরে ডাক্তার এসে জানাল—হরির স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করে মারা গেছে। খবরটি শুনে সবাই মর্মাহত। বেচারা ডাক্তার-চিকিৎসা দূরে থাক দু'মুঠো ভাতও পায়নি ঠিকমতো। অপারেশনের ব্যাপারে উদ্বিগ্নতা দেখা দিল। কেননা হরিকে ছাড়া শ্রীমঙ্গল যাওয়া সম্ভব নয়। আর এ অবস্থায় না হরিকে নিয়ে যাওয়া উচিত, না যাবে নতুন কোনো বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীল গাইড খুঁজে বের করা। আধাঘণ্টা পরে হরি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো। রেইড দলের কমান্ডার ক্যাপ্টেন হাফিজ হরিকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন। যদিও হাফিজ জানেন হরিকে সান্ত্বনা দেয়া যায় না। সম্পূর্ণ শেকড়হীন একটা হতদরিদ্র মানুষকে এ অবস্থায় সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। হাফিজ জিজ্ঞাসা করলেন হরিকে—শ্রীমঙ্গল যাবার অন্য কোনো গাইড পাওয়া যাবে কিনা। হরি চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিল, "স্যার, বউ মরছে তো কিতা অইছে। চিন্তা কইরেন না। আমিই লইয়া যামু আপনেগো শ্রীমঙ্গল।"

এই অশিক্ষিত শ্রমিকের দৃঢ়তায় অবাক হাফিজের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে এলো। সে-রাতে গাইড হরির সাহায্যে রেইড দলটি সফল অপারেশন করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদে ক্যাম্পে ফেরত আসে। ক্যাপ্টেন হাফিজ হরিকে অনুরোধ করলেন তাদের সাথে থেকে যেতে। বোকাসোকা হরি নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পর বলল—সে চলে যাবে। হাফিজ জিজ্ঞাসা করলেন, সে যাবে কোথায়? তার তো যাওয়ার জায়গা নেই। তার চেয়ে ইউনিটের (১ম ইস্ট বেঙ্গল) সাথে থেকে যেতে। হরি আবারো নিরুত্তর। হরি থাকবে না। সে চলে যাবে। কোথায় যাবে, সে নিজেও জানে না। তবুও সে যাবে। হরি যেন এক বাউল। তার গ্রন্থ থাকতে নেই।

আমাদের হরি হারিয়ে গেল সবহারাদের মাঝে।

তিন.

নাসিরদের ৪২ জনের প্লাটুনটি তখন কুমিল্লার মুরাদনগর থানার পরমতলা গ্রামে। থানা সদর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাস। সন্ধ্যার পর কোম্পানীগঞ্জ থেকে সোর্স খবর নিয়ে এলো মাঝরাতের পর পর কিছু গাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিক থেকে কোম্পানীগঞ্জ হয়ে ময়নামাঈ সেনানিবাস যাবে। কিছুক্ষণ থামবে গাড়িগুলো কোম্পানীগঞ্জ পাকিস্তানি ক্যাম্পে কোনোকিছু নামাতে বা তুলতে। গাড়িগুলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার বা সিলেট থেকে হয়তো আসবে। খুবই বিশ্বাসযোগ্য সোর্স এবং তার দেয়া খবরাখবর খুবই নির্ভরযোগ্য। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো—এ গাড়ির বহর এম্বুশ করা হবে।

AMARBOI.COM

সময় নেই হাতে। রেকি করবার সুযোগও নেই এখন। কিছু কোদাল, শাবল জোগাড় করতে হবে। খাওয়ার কথা কেউই ভাবার সময় পেল না। হঠাৎ করেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ম্যাগজিনে গুলি লোড করা, অস্ত্র পরিষ্কার করা—সবই হলো অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। দু'টি এনারগা-৯৪ গ্রেনেড নিয়ে নাসির এ এম্বুশ সম্বন্ধে খুব আশাবাদী। দু'টি গ্রেনেডই সে সবচেয়ে সামনের গাড়িতে লক্ষ করে মারবে। কেননা সামনের গাড়িকে থামানো গেলে পেছনের গাড়িগুলো থামতে বাধ্য।

পথ চেনা বা এম্বুশের অবস্থান নির্বাচন করা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় নাসির। ছেলেরা সব আশেপাশের এলাকার। এ এলাকার পথ-ঘাট, খাল-বিল সব এদের মুখস্থ। রাস্তার পাশে একটি গ্রামে পৌঁছল তারা। তখন রাত সাড়ে বারোটার মতো বাজে। এম্বুশের দুই 'কাট অফ পার্টি' রাস্তার দুই দিকে লাগিয়ে নাসির তার 'মেইন বডি'-র অবস্থান নির্ধারণ করে ফেলল। তাদের বাম দিকের অর্থাৎ কোম্পানীগঞ্জের দিকের ১ নম্বর 'কাট অফ পার্টি-র কাছে হুইসেল। শত্রুর গাড়ি আগমনের সংকেত দেয়া হবে এই হুইসেল বাজিয়ে। এম্বুশের পর পশ্চাদপসরণের সংকেত, মিলনস্থান ইত্যাদি সব মোটামুটি এই স্বল্প সময়ে নির্ধারণ করে সবাইকে তার আদেশে জানিয়ে দিল নাসির। বলা হল শত্রু না আসা পর্যন্ত সবাই নিজেদের ট্রেঞ্চ খুঁড়তে থাকবে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া সম্পূর্ণ হবার আগে শত্রু এলেও এম্বুশ কার্যকরী হবে। সম্ভব হলে খনন কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। তাতে শত্রুর পাল্টা গুলি থেকে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে।

ভোরের আলো ফুটবার আগেই খনন কাজ শেষ হয়ে গেল প্রায় সবার। এরা যখন রাতে এখানে এসেছে, গ্রামবাসী তখন গভীর ঘুমে। এখনো কোনো জনমানবের যাতায়াত নেই। সকালের মধ্যে শত্রুর গাড়ি না এলে এদের স্থান ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। দালাল, রাজাকারদের আপদের কারণে দিনের আলোয় শত্রু অবস্থানের এত কাছাকাছি অবস্থান নিরাপদ নয়। এ এলাকায় এ পশুগুলোও বেশ সংঘবদ্ধ। যতই ভোরের আলো ছড়াচ্ছে ততই বিরক্তি সবার মুখে। সারারাত খাওয়া-দাওয়া নেই। প্রায় দৌড়েই আসতে হয়েছে এই অবস্থানে। তারপর খোঁড়াখুঁড়ি। দীর্ঘ অপেক্ষা যেন হঠাৎ করেই সবাইকে ক্লান্ত করে ফেলল। যুদ্ধ করতে না পারার এ একরকম হতাশা। ঠিক এমন সময় হুইসেল বেজে উঠল। সবাই মুহূর্তের মধ্যেই তৈরি। আনন্দে শিহরিত এক মরণ খেলা খেলবার জন্য। দূরে তিনটি শত্রুর লরি আসতে দেখা যাচ্ছে এবার। ধীর গতিতে আসছে গাড়িগুলো। গাড়ির পার্কিং লাইটগুলো এখনো জ্বালানো। চারদিকে সুনসান নীরবতা। এনারগা-৯৪ তৈরি। কারণ এ অস্ত্রটির কাজ সবচেয়ে আগে।

একী! এ বুড়ি এখানে কী করছে? বুড়ি দুই হাত ভাঁজ করে কনুইগুলো উঁচু করে এদের অবস্থানের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। বয়সের ভারে এই রোগা বুড়িটিকে উচ্চতায় আরো ছোট করে ফেলেছে। নীল পাড়ের সবুজ শাড়ি পরে বুড়ি

AMARBOI.COM

এদিকে আসছে কেন, কেউই বুঝতে পারছে না। গাড়িগুলো এক্ষুণি এসে পড়বে। আর তখনই গর্জে উঠবে সব হাতিয়ার। বুড়ি মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর বুড়িকে বাঁচাতে গেলে গাড়ি চলে যাবে। সব শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। আক্ষেপের অন্ত থাকবে না। নিচু জায়গা দেখে শুয়ে পড়তে বুড়িকে বলাও যাচ্ছে না। কিছুই বুঝবে না সে। সিদ্ধান্ত নেবার সময়ও নেই নাসিরের। ভাবতে ভাবতেই বুড়ি বাম দিকের ট্রেঞ্চের সামনে এসে পড়ল। শাড়িতে ঢাকা ভাঁজ করা হাত খুলে দুটো ভাতের গামলা নামিয়ে মাটির উপর রাখল। কোনো তাড়া নেই তার। ভাতের মাঝখানে গর্ত করে রাখা বাটিতে তরকারি। গরম ভাত থেকে ভাঁপ উঠছে। ট্রেঞ্চে দাঁড়ানো একটি ছেলের গায়ে পরম আদরে হাত বুলিয়ে বুড়ি বলছেন, 'বাবারা, তোমরা যুদ্ধ-টুদ্ধ যাই-ই করো আগে চাইড্ডা ভাত খাইয়া লও। শইলে জোর অইবো।"

এই বুড়ি কি এদের আগমন টের পেয়েছিলো? খুব সম্ভবত তাই। তারপর? তারপর উঠানের ওপাশে খড় আর পাটকাঠি দিয়ে বসে বসে সারারাত ভাত রেঁধেছে তার এই সন্তানদের জন্য। তরকারি হয়তো আগেই রাঁধা ছিল ঘরে। বুড়ি তো আর যুদ্ধ দেখেনি। তার কাছে শরীরের জোরের একটা মুখ্য ভূমিকা হয়তো আছে যুদ্ধে। কী গভীর মমতায় সারারাত বৃদ্ধা এক জননী তার সর্বাত্মক যত্নের আয়োজন করেছে। কী গভীর এই অন্তহীন মাতৃত্ববোধ।

বুড়ির কষ্টের তৈরি খাবার যেভাবে ছিল ওভাবেই পড়ে রইল। একটা ছেলে বুড়ির কোমর ধরে শুন্যে তুলে ট্রেঞ্চে ঢুকিয়ে দিল। একটা এনারগা গ্রেনেড লক্ষভ্রষ্ট হয়। তবে যে একটা প্রথম গাড়িটিতে লাগে, তাতেই উদ্দেশ্য সফল হয়। সব হাতিয়ার একসাথে গাড়ি তিনটিকে এবং আরোহী সৈন্যদের গুলিতে ঝাঁজরা করে ফেলে। গাড়িতে সৈন্য সংখ্যা অনুমান করা যায়নি। অল্প কয়েকজনকে মাত্র লাফিয়ে নিচে পড়তে দেখা গেছে।

অধিনায়কের সংকেতের সাথে সাথেই শুরু হলো দৌড়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 'মিলনস্থান'-এ পৌঁছতে হবে। এক যোদ্ধার কোলে আড়াআড়ি শুয়ে যাচ্ছে এক বৃদ্ধা জননী, যেন লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার মা।

চার.

কোতোয়ালি থানার ভেতরে হলেও মোহনপুর গ্রাম দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। জয়নাল আবেদীন এ গ্রামেরই এক খেটে খাওয়া গেরস্থ। স্ত্রী, কিশোরী মেয়ে আর শিশুপুত্র নিয়ে সংসার। আর দশজন শ্রমজীবী কৃষকের মতোই 'সুখে-দুঃখে লেপ্টে থাকা বারো মাসের বছর' জয়নালের। জয়নালরা রাজনীতির সুফলের অংশীদার হয় কদাচিৎ, কিন্তু রাজনীতির ভোগান্তির সবটুকুই ভোগে। একাত্তরও এর ব্যতিক্রম রইল না। ছোট্ট ভুবন জয়নালের। এক প্রস্থ ভিটার ওপর এক রত্তির এক ঘর। তথাকথিত ইসলামী উম্মাহর ধ্বজাধারী পাকিস্তান নামক দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় মাথায় টুপি আর জানুর নিচে নামানো

AMARBOI.COM

আলখেল্লায় আবৃত ইসলামের খেদমতগাররা (?) পাকিস্তানি সেনাদের গ্রামে গ্রামে নিয়ে যায়। সবটাই অবশ্য ওদের পাকিস্তানের প্রতি সেবামূলক মনোবৃত্তি বা প্রভুভক্তি নয়। ব্যাপক ব্যক্তি-পরিচিতি এবং সামাজিক প্রতাপ প্রদর্শনের মোহে এরা ছিল সম্মোহিত। এক সকালে এই সেবাদাসরা পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ে এলো মোহনপুরে। জয়নাল এর কিছুই জানত না। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। দু'কোঠার ঘরের এক কোঠায় ধর্ষণ করা হলো জয়নালের স্ত্রীকে; অপর কোঠায় কিশোরী কন্যাকে। কিশোরী মেয়ে ভালোভাবেই জানত পাশের ঘরে তার স্নেহময়ী মায়ের অসহায় অবস্থা এবং তার মাও জানত অপর ঘরে তার আদরের কন্যার করুণ পরিণতি। কারো কাছে অভিযোগ করল না মেয়ে, অনুযোগও করল না কোনো। গ্লানি ঢাকল সে গলায় দড়ি দিয়ে। লজ্জাটুকু রেখে গেল আমাদের জন্য।

এক বছরের শিশুপুত্রকে বাম কাঁধে নিয়ে দৌড়ে পালাতে চাইল একই গ্রামের মহিরউদ্দিন। ছ'ফুট উচ্চতার সুঠামদেহী মহিরউদ্দিনের হৃৎপণ্ডি পেছন থেকে ভেদ করে গেল ঘাতকের গুলি। মহিরউদ্দিন এক পাও এগুতে পারেনি আর। কাঁধের ছেলেকে বুকের নিচে ফেলে উপুড় হয়ে পড়ল মহির। মহান করুণাময় আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞাত। মৃত পিতার রক্তে স্নাত শিশু নিশ্চিতে ঘুমিয়ে রইল বাবার কোলে। শিশুর দু'পায়ের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। সেই শিশু দেলোয়ার এখন যুবক, ঠিক যেমন যুবক আজ এই বাংলাদেশ।

পাঁচ.

দাউদকান্দি থেকে কুমিল্লার দিকে এগারো/বারো মাইল গেলেই ইলিয়টগঞ্জ বাজার। ইলিয়টগঞ্জ বাজার সংলগ্ন নবনির্মিত সেতুটি ঢাকা-কুমিল্লা সরবরাহ লাইনের ওপর অবস্থানের কারণে এর রণকৌশলগত গুরত্ব ছিল যথেষ্ট। সেতুটি উড়িয়ে দেবার বা ব্যবহার অনুপযোগী করবার পরিকল্পনা করলেন মেজর হায়দার। মেজর হায়দার একজন ব্যতিক্রমধর্মী অফিসার। যুদ্ধ সংক্রান্ত তার বিবেচনা আর সবার মতো নয়, একদমই আলাদা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের অফিসার (কমান্ডো) মেজর হায়দার অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বিস্ফোরক বিষয়ে ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি পরিকল্পনা করলেন টিএনটি (TNT) স্ল্যাব দ্বারা কাটিং চার্জের মাধ্যমে ইলিয়টগঞ্জ সেতুটির একটি পিয়ার ভেঙে ফেলে সেতুটি পূর্বদিকে কাত করে পানিতে ফেলে দিতে। সেতুটি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে যে পরিমাণ বিস্ফোরক প্রয়োজন, এ পদ্ধতিতে তার চেয়ে অনেক কম বিস্ফোরকের প্রয়োজন হবে। অথচ লাভ হবে সেতুটি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয়ার চাইতে অনেক বেশি। কেননা সেতুটির একটি পিয়ার ছাড়া (যেটি কাটিং চার্জদ্বারা ভেঙে ফেলা হবে) আপাতদৃষ্টিতে দেখতে অক্ষত দেখালেও কোনোভাবেই এ সেতুটি পুনঃব্যবহারযোগ্য করা যাবে না এবং নতুন সেতু তৈরি করতে হলে ক্ষতিগ্রস্ত সেতুটিকে সম্পূর্ণ ভাঙতে হবে। যুদ্ধের মাঠে নিহত সৈনিকের চেয়ে বহুলাংশ বেশি বিড়ম্বনা একজন আহত

AMARBOI.COM

সৈনিক। মেজর হায়দার নবনির্মিত এ সেতুটির আংশিক ক্ষতি করেও একই ধরনের বিড়ম্বনা সৃষ্টি করতে চাইলেন শত্রুর জন্য। মেজর হায়দার এবং অন্যরা প্রায় চার-পাঁচশ গজ উত্তরে কালাডুমুর এলাকায় আত্মগোপন করে আসিফকে পাঠালেন একটি ছোট কোষা নৌকা দিয়ে সেতুটির পিয়ারের মাপ আনবার জন্য। শহরের ছেলে আসিফ। মাটি ও মানুষের সাথে তার সম্পর্ক নেই মোটেও। ক্যাডেট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা ফেলে এসেছে সে যুদ্ধ করতে। তার প্রায় সব সহপাঠীই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজে গেছে। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ইসলামিয়াতের শিক্ষক আবদুল করিম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পেয়েছেন। এ তথ্য সে জেনেছে তার বাবার কাছে পাঠানো করিমের টেলিগ্রামের মাধ্যমে। আসিফ শুনেছে তার অধ্যক্ষ লে. কর্নেল মোহাম্মদ মঞ্জুরুর রহমানকে পাকিস্তানিরা কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতর গুলি ক'রে হত্যা করেছে। আর্মি এডুকেশন কোরের এ বাঙালি অফিসারের তখন ২৭/২৮ বছর চাকরি। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কর্নেল রহমানের সাথে শত্রুরা হত্যা করেছে ইতিহাসের অধ্যাপক আব্দুল হালিমকে। সৎ কাজ ও সত্য বলার দোষে দুষ্ট বাংলার অধ্যাপক সফিকউল্লাহ অসীম সাহসে সশস্ত্র প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলছেন হানাদারদের বিরুদ্ধে। কথায় ও কাজে সঙ্গতি আছে এমন লোক চাইলে সফিকউল্লাহর সাথে পরিচিত হতে পারেন। এরই মাঝে করিম অধ্যক্ষের শূন্য আসন অলংকৃত করেছেন। টেলিগ্রামে অধ্যক্ষ করিম আসিফের বাবাকে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি তার ছেলেকে কলেজে যোগ দিতে পাঠান; অন্যথায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সামরিক আইনবলে তার বিচার করা হবে। ছোট গড়নের সহাস্য চেহারার শ্রদ্ধেয় এই অধ্যাপকের ভেতরের পশুটি দেখবার আশা পোষণ করে আছে আসিফ।

লুঙ্গি পরবার অভিজ্ঞতা নেই আসিফের, অথচ এ মুহূর্তে লুঙ্গি পরে সেতুর পিয়ার মাপতে গেছে সে। কুমিল্লার মুরাদনগর থানায় বাড়ি হলেও আসিফ তার গ্রামের বাড়িতে পৌষ-পার্বণ ছাড়া এসেছে বলে স্মরণ নেই। যত গ্রামীণ লেবাসই আসিফ পরুক না কেন চেহারায় শহুরে ভাবটা তার রয়েই গেছে। শান্তি কমিটির সদস্যরা জোর করে নৌকা ভিড়াল আসিফের। জিজ্ঞাসাবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে তারা কিছু চড়-ঘুষিও মারল তাকে। তারপর তাকে তারা হস্তান্তর করল এলো ইলিয়টগঞ্জ হাইস্কুলে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈনিকদের কাছে। কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই একটি শ্রেণীকক্ষে বন্দি করা হলো আসিফকে। দুপুরের দিকে পঞ্চাশোর্ধ এক প্রৌঢ় গেরস্থকে এনে ঢুকানো হলো আসিফের ঘরে। লোকটিকে এমনভাবে নির্যাতন করা হয়েছে যে, তার মুখমণ্ডল থেঁতলিয়ে ও ফুলে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। হাঁটলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সেদিকে যেন মোটেও খেয়াল নেই এই প্রৌঢ়ের। আসিফের কাছে এসে বসল। গ্রামের সাথে যোগাযোগ না থাকলেও আসিফ গ্রামের কথা সবই বোঝে এবং বলতেও পারে বেশ। লোকটি এমনভাবে অনুনয় করতে লাগল আসিফের কাছে যে, সে আসিফ সত্য কথাটাও বলতে পারল

AMARBOI.COM

না। বলতে পারল না যে সে নিজেও তারই মতো একজন বন্দি। যে বন্দিত্বের কারণ পাকিস্তানিদের এদেশীয় দোসররা। লোকটির বক্তব্য সে কী অন্যায় করেছে নিজেও জানে না, কেউ তাকে বললও না। যে তাকে পাকিস্তানিদের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে সেও বলেনি। তার কথা যে, পোলাপাইনগুলিরে (মুক্তিযোদ্ধাদের) চারটা ভাত খেতে দিয়েছিল। এর মধ্যে অন্যায়ের কী আছে। আসিফকে অনুরোধ করছিল যেন সে একটু এদের বলে দেয়, ঈদের কয়েকটা দিলে বাকি, কয়টা টাকাও সে বাড়িতে দিয়ে আসতে পারেনি। তাকে বিকেলে ছেড়ে দিলে সারারাত হেঁটে সে সকালেই বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবে। বিকেল চারটার দিকে পাকিস্তানি এক নায়েব সুবেদারের নির্দেশে লম্বা একটি ছুরি দিয়ে এক রাজাকার এই প্রৌঢ়কে ঘর থেকে বের করে নিয়ে মাঠে জবাই করল। আসিফ জানালা দিয়ে সে দৃশ্যের কিছুটা দেখেছে। জবাই করার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলে আড়াই পোচে জবাই করা হয়েছে কিনা আসিফ তা খেয়াল করতে পারেনি। সে রাতেই মেজর হায়দাররা রেইড করলেন এই স্কুল সংলগ্ন পরিত্যক্ত পুরনো সেতু এলাকায়। দাউ দাউ করে জ্বলছে সেতুর ডেকিং-এর কাঠ। এলোপাতাড়ি চলছে গুলি। আসিফ তার বার্তা পেয়ে গেল। প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে পালাল সে ক্লাসরুমের বেড়া ভেঙে।

ছয়.

যশোর সেনানিবাস থেকে একাত্তরের ৩০ মার্চ লে. হাফিজ ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মাত্র দু'শর মতো সৈনিক নিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। এই ব্যাটালিয়ানটি জুন মাসে পশ্চিম পাকিস্তান বদলি হওয়ার জন্য নির্দেশিত ছিল। কাজেই প্রায় অর্ধেক ব্যাটালিয়ান সৈনিক (৩৫০ জনের মতো) ছিল দুই মাসের ছুটিতে (Pre-Embarcation Leave)। বাকি প্রায় ১০০ জনের মতো সৈনিক যশোর সেনানিবাসে ২৫ বেলুচ রেজিমেন্ট ও ৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের আক্রমণে এবং সেনানিবাস থেকে শত্রুর গুলির ভেতর দিয়ে পশ্চাদপসরণের সময় হতাহত হয়। শত্রুর সাথে যুদ্ধে শহীদ হন সেকেন্ড লে. মোহম্মদ আনোয়ার হুসেইন, বীর উত্তম। বাঙালি অধিনায়ক লে. কর্নেল রেজাউল জলিল মুক্তিযুদ্ধে এই যুদ্ধে ব্যাটালিয়ানের নেতৃত্ব দিতে সাহস পাননি। তিনি সেনানিবাসেই থেকে যান। ঢাকার নবাব পরিবারের অপর বাঙালি অফিসার সেকেণ্ড লে. শফি ওয়াসিউদ্দীন (লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দীনের ছেলে) পাকিস্তানিদের পক্ষ নেয়।

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ এলো ৬০০ তরুণ ভর্তি করে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে একটি পূর্ণাঙ্গ পদাতিক ব্যাটালিয়ানে রূপান্তর করবার। বিভিন্ন ইয়ুথ ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে এই তরুণদের নির্বাচন করতে হবে। সত্তরে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব তারা মিয়া একটি ইয়ুথ ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-ক্যাপ্টেন হাফিজের আগমনের উদ্দেশ্য শুনে আনন্দিত হলেন। সারা ক্যাম্পে এ খবরে আনন্দের বন্যা

বয়ে গেল। কেউ একজন হুইসেল বাজাতেই মিনিট দু'য়েকের মধ্যে প্রায় চারশ' ছেলে তাড়াহুড়ো করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। এদের বয়স পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ। তাদের অধিকাংশের পরনে ময়লা কাপড়। দীর্ঘদিন এরা একবেলা গন্ধযুক্ত মোটা চালের ভাত ও কুমড়ার তরকারি খেয়ে বেঁচে আছে। কেবলই অপেক্ষা—কবে অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ পাবে। অর্ধাহারে শীর্ণ দেহ, পরনে জীর্ণ পোশাক—কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল কী অপরূপ দীপ্তি, দেশপ্রেমের কী উজ্জ্বল ছটা। চোখে সবার প্রতিরোধের আগুন। মুখে একটাই কথা, 'স্যার, একটা অস্ত্র দেন, যুদ্ধ করব।'

সৈনিক হিসেবে ভর্তির জন্য উচ্চতা বেঁধে দেয়া হয়েছে—৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। শতকরা নব্বই জন বাদ পড়ে যায়। ডাক্তারি পরীক্ষায় আরো কিছু বাদ পড়ে, কিছু বাদ পড়ে বয়সের কারণেও। অধিকাংশ যুবক বাদ পড়ায় তাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। বাদ পড়া ছেলেরা ক্যাপ্টেন হাফিজকে ঘিরে তাদের ভর্তি করার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকে। কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাদের বক্তব্য—তারা দেশের জন্য যুদ্ধ ক'রে শহীদ হতে চায়; উচ্চতার কারণে বা বয়সের কারণে তাদের বাদ দেয়া যাবে না। হালকা পাতলা গড়নের ছোটখাটো একটি ছেলে বাদ পড়ায় ক্যাপ্টেন হাফিজের জিপের সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়ল। ছেলেটির নাম মহিউদ্দীন। যশোর শহরে তার বাবার একটি বন্দুকের দোকান আছে। তাকে ভর্তি করা না হলে সে ওখান থেকে নড়বে না। তার সোজা কথা তাকে ভর্তি করা না হলে তার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয়া হোক। তিন চারজন মিলে টানা হ্যাঁচড়া করেই তবে তাকে সরানো হলো।

'স্যার, এভাবে উচ্চতা মেপে ভর্তি করা যাবে না। এটা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই। আমাদের হাতে একটা ক'রে গ্রেনেড দেন, শত্রুর ব্যাংকার দেখিয়ে দেন, যে একাকী শত্রুর ব্যাংকারের ওপর গ্রেনেড ছুঁড়ে আসতে পারবে তাকেই ভর্তি করুন। সাহসের পরীক্ষা নিন।'—মহিউদ্দীনের সোজা সাপটা জবাব। তার জেদ এবং সাহসী বক্তব্য শুনে অবশেষে তাকে ভর্তি করতে বাধ্য হলেন ক্যাপ্টেন হাফিজ।

জুন মাসে ১ম ইস্ট বেঙ্গলকে পুনর্গঠিত করে মেঘালয় রাজ্যের ছোট শহর তুরার মাইল দশেক উত্তর পশ্চিমে গভীর জঙ্গলের ভেতর জনমানবহীন এলাকা তেলঢালায় নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে আরো আনা হলো ৩য় এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং গঠন করা হলো বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম পদাতিক ব্রিগেড 'জেড ফোর্স'।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সিলেট এলাকায় নিয়ে আসা হয়। ১৩ ডিসেম্বর মাঝ রাতে তারা সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজের উত্তর দিকে এসে পৌঁছে। এখানে ছিল শত্রুর প্রতিরক্ষা। আমাদের সৈনিকদের খাকি পোশাক দেখে পাকিস্তানিরা তাদের নিজেদের লোক বলে ভুল

AMARBOI.COM

করে গুলি করেনি। খুব কাছে এলে মুক্তিবাহিনী বলে চিনতে পারে এবং তখন গুলি ছুঁড়ে। আমাদের সৈনিকদেরও শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ১৪ ডিসেম্বর ভোরে শত্রুকে পরাভূত করা হয়। পাকিস্তানিরা নিহত ও আহত সঙ্গীদের ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। আমাদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। ৭ জন শহীদ এবং ১৪ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। খর্বাকৃতির বলে যাকে একদিন সেনাবাহিনীতে ভর্তির অযোগ্য করা হয়েছিল, সেই সদাহাস্যময় সাহসী তরুণ মহিউদ্দীন বীরত্ব ও দেশেপ্রেমের পরীক্ষায় নির্বাচিত হলো। স্বাধীনতার সূর্য যখন উদীয়মান, ক্ষ্যাপা যোদ্ধা মহিউদ্দীন তখন নিজেকে উৎসর্গ করল আমাদের জন্য।

সাত.

৩ আগস্ট। ময়মনসিংহ সীমান্তে নক্‌শী বিওপি-তে পাকিস্তানিদের শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থান দখল করার জন্য আক্রমণ রচনা করবে। আক্রমণ পরিচালনা করবেন ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক মেজর আবু জাফর মোহাম্মদ আমিনুল হক। আক্রমণের সময় রাত ৩-৪৫ মিনিট। দুই কোম্পানির মোট তিনশ' জনের মধ্যে দশ জন পদাতিক সৈনিক, আট জন ইপিআর, তিনজন পুলিশ, বাকি সবাই সাত দিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামবাংলার অতি সাধারণ কিশোর, ছাত্র, জনতা-আমাদের গণযোদ্ধা।

পাকিস্তানিরা পরিকল্পিত এ প্রতিরক্ষার সামনে মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমনের আশঙ্কায় মাইন ফিল্ড, সূঁচালো বাশের কঞ্চি (পাঞ্জি), নিচু কাঁটাতারের বেড়া, উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করেছে। আক্রমণস্থান (Forming Up Place) থেকে শত্রুর অবস্থানের (Objective) দূরত্ব প্রায় ছয়শ' গজের মতো। এর আগেও একবার শত্রুর এই অবস্থানের ওপর আক্রমণ রচনা করে সফলতা লাভ করা যায়নি। কাজেই এবারের আক্রমণের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্টেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়।

আক্রমণের জন্য সবাই আক্রমণস্থানে উপুড় হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে। নির্দেশ পেলেই অস্ত্র ফায়ারিং পজিশনে নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। ঠিক ৩-৪৫ মিনিটে ক্যাপ্টেন আমিন আক্রমণপূর্ব গোলান্দাজ সহায়তা চেয়ে বেতার যন্ত্রে 'জোরে মার' শব্দদ্বয় ব্যবহার করলেন। সাথে সাথে শুরু হয় আমাদের গোলাবর্ষণ। এই শব্দদ্বয়ের অর্থ ছিল আর্টিলারি সমর্থন চাওয়া। আক্রমণের প্রথম বিপত্তি দেখা দিল তখনি। নিজেদের কয়েকটি গোলা ভুলে পড়ে আক্রমণস্থানে—আক্রমণকারী যোদ্ধাদের উপর। অযাচিত এক ভয়াবহ বিপর্যয়। আহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিশৃংখলাও দেখা দেয়। ছেলেরা সব হতবিহ্বল ও বিরক্ত। কিছুক্ষণের মধ্যে গোলা পড়া বন্ধ হলো। পুনঃসংগঠিত করা হলো

AMARBOI.COM

আক্রমণকারী যোদ্ধাদের। আক্রমণ শুরু হলো। শত্রুর আর্টিলারি প্রায় সাথে সাথেই গর্জে উঠল। নির্ভিক যোদ্ধারা শত্রুর গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নিজেদের আর্টিলারি ফায়ার শত্রু প্রতিরক্ষায় তেমন কোনো পরিবর্তন বা ধ্বংসই আনতে পারল না। পাকিস্তানিদের শক্ত এ প্রতিরক্ষায় ব্যাংকারগুলো আর্টিলারি ফায়ারে যেন ক্ষতি না হয় সেভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে। আমাদের হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তবে আক্রমণকারী কিছু ছেলে এরই মধ্যে শত্রু অবস্থানে পৌঁছে গেছে। বাকিরা অনেকেই আটকে গেছে শত্রুর পোতা মাইন ফিল্ডে এবং কাঁটাতারের বেড়ায়। হতাহতের সংখ্যা বেড়ে এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে, আক্রমণে শত্রু অবস্থান দখলের সৈন্য সংখ্যা তখন আর নেই। আমিন তবুও আক্রমণ অব্যাহত রাখতে চেঁচিয়ে ছেলেদের মনোবল উঁচু রাখার চেষ্টা করছেন। তিনি জানেন আর কিছু যোদ্ধা নিয়ে শত্রু অবস্থানে পৌঁছতে পারলেই জয় সম্ভব। শত্রুর পোতা সূঁচালো বাঁশের কঞ্চি অলক্ষে আমিনের বাম পায়ে বিঁধে তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে। এ পর্যায়ে আক্রমণ আর পরিকল্পিত রইল না। এ অবস্থায় এক শত্রুসেনা ক্যাপ্টেন আমিনকে বেয়নেট দিয়ে চার্জ করতে এগিয়ে আসে। পাশেই ছিল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সালাম। শত্রুসেনা কিছু বুঝে উঠবার আগেই মুহূর্তেই সালাম তার .৩০৩ রাইফেলের মাথার বেয়নেট দিয়ে ওকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেললো।

এক সুবেদার মেজরের ছেলে সালাম। বর্বর পাকিস্তানি পশুরা তার বাবা-মা, ভাই বোনদের নির্মমভাবে তারই সামনে হত্যা করে। আপনজনদের হত্যার এই বিভীষিকা এই কিশোরকে করেছে এক প্রত্যয়ী যোদ্ধা। বহুদিন, বহুবার সালাম ক্যাপ্টেন আমিনকে অনুরোধ করেছে—তাকে আক্রমণে নিয়ে যাবার জন্য। এক জীবনে কত কষ্টের ভার বহন করা যায়? বাবা-মা হারা এই ছোট ছেলেটির বুকে কত গভীর ক্ষত, আমিন তা কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সালামকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে আক্রমণ থেকে বিরত রাখতেন। কিন্তু কোনো বাৎসল্যই সালামকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। পিছুটানের আর কিছুই ছিল না সালামের এই পৃথিবীতে। তার অন্তরে অপ্রতিরোধ্য প্রতিশোধস্পৃহা। আক্রমণের পূর্বে সমবেত এলাকায় (Assembly Area) আমিন বিস্ময়ে লক্ষ করেন সালাম রাইফেল নিয়ে আক্রমণকারী দলে যোগ দিয়েছে। আমিনকে দেখেই অন্যান্য সৈনিকদের আড়ালে নিজেকে লুকাবার চেষ্টা করছিল। পাছে ক্যাপ্টেন আমিন তাকে আক্রমণে যেতে না দেন। আমিন সব দেখেও কিছু বলেননি। নির্বিকার থেকে সালামের ইচ্ছা পূরণের সম্মতি দিলেন।

বিচ্ছিন্নভাবে হলেও আক্রমণ এগিয়ে যাচ্ছে। শত্রু অবস্থানের প্রায় পাঁচ গজ কাছে এলে আমিনের ডান হাতের কনুইয়ে গুলি লাগে। আর এগোনো সম্ভব নয়। শত্রু পিছিয়ে গিয়ে পুনঃসংগঠিত হয়ে প্রতিআক্রমণের (Counter Attack) প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাইড রোল করে আমিন তার অসাড় দেহ নিয়ে পশ্চাদপসরণের

AMARBOI.COM

চেষ্টা করছেন। ছোটখাটো গড়নের এবং খর্বকায় দেহের ক্যাপ্টেন আমিনের দেহ থেকে অঝরে রক্ত ঝরছে। শরীর হিম হয়ে আসছে দ্রুত। সালাম সেই থেকেই আমিনের পাশে পাশে। হঠাৎ সালাম নিজের রাইফেল ফেলে নিহত এক যোদ্ধার পড়ে থাকা এলএমজি (হালকা মেশিনগান) তুলে নিয়ে 'জয় বাংলা' হুংকার দিয়ে গুলি করতে করতে শত্রুর অবস্থানের দিকে একাই দৌড়াতে শুরু করে। গুলি করছে আর চিৎকার করছে। এই যুদ্ধের মাঠে গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে কেউ শুনছে না সালামকে। আমিন শুনছে—সালাম চিৎকার করে বলছে, 'তোরা আমার বাবা-মা-ভাই-বোনদের মেরেছিস, তোরা কি মনে করেছিস আমি তোদেরকে এমনিই ছেড়ে দেব?' এইটুকুন এই ছেলে সালামই কিছুক্ষণ আগে বেয়নেট দিয়ে শত্রুসেনাকে হত্যা করে ক্যাপ্টেন আমিনের প্রাণ বাঁচিয়েছে। রক্তস্নাত, নির্ভীক আমিন অতি কষ্টে ক্ষীণস্বরে ডাকলেন, 'সালাম চলে এসো, সালাম চলে এসো'। সালামের ভ্রুক্ষেপ নেই। হাতে এলএমজি, সামনে পাকিস্তনি পশু; আর ভাবনা নেই, আর ভয় নেই। এখনই তো প্রতিশোধের সময়। সালাম আর ফেরেনি। প্রাণ ভরে, প্রাণ দিয়ে তার সব প্রতিশোধ নিয়েছে।

রক্তের দাগ দেখে শত্রুরা আহত ক্যাপ্টেন আমিনকে খুঁজতে খুঁজতে ধানক্ষেতের ভেতর প্রায় পনেরো গজের মধ্যে এসে পড়েছে। অসীম সাহসী অধিনায়ক মেজর আমিনুল হক হাবিলদার তাহেরকে নিয়ে শত্রুর মুখ থেকে ক্যাপ্টেন আমিনকে কাঁধে নিয়ে ক্রলিং করে পিছিয়ে আসতে থাকেন। সেকেন্ড লে. মোদাচ্ছের জীবনের সব ঝুঁকি নিয়ে উঁচু গাছের নিচে থেকে মেশিনগানের কভারিং ফায়ারে তল্লাশি শত্রুদের হত্যা না করলে ক্যাপ্টেন আমিনকে উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভব হত না।

নক্‌শী বিওপি দখল হয়নি, সত্যি। কিন্তু নক্‌শী বিওপি-র আক্রমণ বিচার করতে হবে সাফল্য দিয়ে নয়—সাহসিকতা আর মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রেম দিয়ে।

আমাদের বায়ান্নার সালাম আর একাত্তরের সালামদের বারবার আসতে হবে। মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির ভার বইতে হবে তো'।

আট.

মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করার অনুষ্ঠানগুলোর মেজাজই ছিল ভিন্ন। তখনো ভিড় ছিল, আজো আছে। পার্থক্যটা শুধু বৈশিষ্ট্যগত। এখন ছেলেরা আসে চাকরির আশায়। তখন আসত মাতৃভূমির জন্য মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করার জন্য। পাকিস্তানি পশুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার তখন একটাই পথ ছিল—যুদ্ধ। তবুও তথাকথিত শিক্ষিত, কাপুরুষ, চতুর কিছু লোক এ যুক্তিতে—ব্যাখ্যায় স্বাধীনতা অর্জনটাকে বই-খাতা আর পরিকল্পনানির্ভর ব'লে যুদ্ধের মা বর্জন করে। দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী, ছাত্র, রিকশাচালক, মেকানিক, ড্রাইভার, দিনমজুর এসব পেশার লোক দাঁড়িয়ে যেত যুদ্ধের সৈনিক হবার জন্য। ঢাকা

AMARBOI.COM

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক মাহমুদুর রহমান বেনু এক বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষক। বহু সুপারিশ আর তদবির দ্বারা নিজের পরিচয় গোপন ক'রে সাধারণ সিপাই হিসেবে ভর্তি হয়েছিলেন ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ। সাথে ছিল তার আরেক বন্ধু নাট্যকর্মী লুৎফর রহমান খোকা। এদের দেয়া হলো পাইওনিয়ার প্লাটুনে। প্লাটুন কমান্ডার বা প্লাটুনের অন্যান্য সৈনিকরা কিছুই জানল না এই দুই নতুন রিক্রুটের ইতিবৃত্ত। মাইন লাগানো, ব্রিজ ধ্বংস করা ইত্যাদি এ প্লাটুনের কাজ। কঠিন পরিশ্রমে এবং অপ্রতুল খাবারের কারণে এদের শরীর ভেঙে পড়ল দুদিনেই। শক্ত মাটিতে শুয়ে রাতে ঘুম আসে না কারো চোখে। কিন্তু তারাও হাল ছাড়তে নারাজ, নীরবে সব কষ্ট সহ্য করে ট্রেনিং নিয়ে যাচ্ছে একমনে। চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে সাধারন সৈনিকদের সঙ্গে, অবসর সময়ে বেশ গল্পগুজবও জমে উঠে। পাইওনিয়ার প্লাটুন কমান্ডার হাবিলদার তাজুল একদিন স্যালুট দিয়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন হাফিজের সামনে।

'স্যার, একটা কথা জানতে চাই।'

'বলো, কী ব্যাপার?'

'স্যার, নতুন দুই রিক্রুট নাকি আপনার বন্ধু?'

'হ্যাঁ। এতে কিছু যায় আসে না। তারা তোমার অধীনস্থ রিক্রুট।'

'স্যার, বেনু সাহেব নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ওনাকে অর্ডার দিতে শরম লাগে, কড়া কথাও বলতে পারি না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক যুদ্ধের হুকুম নিতে শরম পাননি স্বল্পশিক্ষিত হাবিলদারের কাছ থেকে। তিনি এসেছেন বাংলাদেশ খরিদ করতে, তা যে মূল্যেই হোক।

শিকারপুর ইয়ুথ ক্যাম্পে সৈনিক ভর্তির সময় যশোরের আজমলকে তার পেশা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে আজমল অম্লান বদনে জানাল, 'স্যার, বেলাক করি।' মাথায় করে মালামাল সীমান্তের এপার ওপার করাকে একটি নির্দোষ পেশা মনে করে এই সহজ সরল যুবক। ছ'ফুট উচ্চতার পঁচিশ বছর বয়সী যুবক আজমল। যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসী। রেকি করার সময় তাকেই সবসময় সামনে রাখে সঙ্গীরা। একদিন বিকালে রেকির সময় একা সে শত্রু ব্যাংকারের একেবারে কাছাকাছি চলে গেছে—না জেনে। হঠাৎ এক পাকসেনা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি। দু'জনেরই অস্ত্র ছিটকে পড়েছে। বাকি পাকসেনারা গুলিও করতে পারছে না। অন্য পাকসেনারা এসে আজমলকে ধরার আগেই সে পাকসেনাকে দুহাতে শূন্যে তুলে নেয়। শত্রুর গুলি যেন না লাগে সেজন্য। পাকসেনাকে শত্রুর দিকে রেখে সে পেছন হয়ে দৌড়াতে থাকে। এরই মধ্যে শত্রুর গুলিবৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। দৌড়ের এক পর্যায়ে আজমলের পরনের একমাত্র লুঙ্গিটিও খুলে পড়ে যায়। দিগম্বর আজমল পাকসেনাকে ঢাল হিসেবে সামনে রেখে উল্টা দৌড়াচ্ছে। পাকসেনা হাত পা ছুড়ে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে

AMARBOI.COM

চিৎকার করছে, আর আজমল বলছে, 'ভাই, আমাকে একটু সামনে এগিয়ে দিয়ে আয়'। প্রায় পঞ্চাশ গজ দৌড়ে একটা গাছের আড়ালে নিরাপদ স্থানে এসে পাঞ্জাবি সৈনিককে ছেড়ে দিতেই দুজনেই দু'দিকে ভোঁ দৌড়।

ওই একাত্তরেই আজমল যা এগিয়েছিল, তারপর আবারো পিছিয়ে পড়েছে আগের জায়গায়।

নয়.

সুনামগঞ্জের পশ্চিমে ধরমপাশা থানাটি একটি দুর্গম এলাকা। এগার নম্বর সেক্টরের একটি প্রধান যাতায়াত পথ বাংলাদেশের এ এলাকা দিয়ে ঢুকে মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী হয়ে ময়মনসিংহের নেত্রকোণা এবং কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়। এ এলাকাটিও মোটামুটি দুর্গম-হাওর-বাঁওড়ের অঞ্চল। আর যত দুর্গম, ততই নিরাপদ পাকিস্তানিদের থেকে।

সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ, শনিবার। কাজী ফোর্সের দু'টি কোম্পানি ধরমপাশা থানায়। অপারেশন শেষে নতুন অপারেশনের জন্য বিশ্রাম ও প্রস্তুতি নিতে এসেছে। চারদিকে প্রহরায় আছে যোদ্ধারা। ভোরের আলো কেবল ফুটছে। তিন প্রহরী মোকলেছুর রহমান, আবদুল হাই এবং এখলাস আহমেদ কোরায়েশী একেবারেই অসতর্ক অবস্থায় পড়ে গেল। বিশাল লোকবল নিয়ে শত্রু প্রায় একশ' গজের মধ্যে এসে গেছে। বিশ্রামরত ছেলেদের খবর দেবার সময়-সুযোগ কিছুই নেই। পাকসেনারাও এমন গা-ছাড়াভাবে আসছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারাও এখানে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান সম্বন্ধে অবগত নয়। এক্ষুণি শত্রুকে আটকাতে না পারলে আমাদের ছেলেরা ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যাবে। দ্বিতীয় কোনো চিন্তা না করেই তিন যোদ্ধা একসাথে গুলি শুরু করল। মোকলেছ দাঁড়িয়েই এলএমজি ফায়ার করে চলেছে। সামনেই হতাহত শত্রুকে ঢলে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এখলাস এবং হাইয়ের কাছে রাইফেল। তিনজনই গুলি করতে করতে পিছিয়ে এসে আবার আড় নিয়ে গুলি করছে। শত্রুর অগ্রাভিযান থেমে গেছে। ক্ষণিকের জন্য হলেও এ সময়টা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের ছেলেদের নিরাপদ পশ্চাদপসরণের জন্য এ সময় অত্যাবশ্যক। পাকসেনারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে 'ফায়ার এন্ড মুভ' কৌশল অনুসরণ ক'রে এগুচ্ছে। দুই দলের মধ্যে কখনও দূরত্ব কমে ৫০/৬০ গজে চলে আসছে। এ অবস্থায় একমাত্র প্রয়োজন শীতল সাহস। এ সময় হাই হঠাৎ এখলাসকে সতর্ক ক'রে চিৎকার করে উঠল তাকে পজিশনে যাওয়ার জন্য। শত্রু ওকে তাক করে গুলি করছে। এখলাস পরিষ্কার না বুঝে বলল, 'কই, কোত্থেকে ফায়ার করছে?' হাই কয়েক পা এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে এখলাসকে ফেলে দিল। ঠিক তখনই তার বুক ভেদ করে গেল ঘাতকের গুলি। সতীর্থ যোদ্ধার জন্য এমন আত্মত্যাগ মানুষের হৃদয়কে নতুন ক'রে নাড়া দেয়। এমন উৎসর্গ কেবলমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। হাই মাটিতেই পড়ে রইল। এখলাস ও মোকলেছ গুলি করে

AMARBOI.COM

চলেছে। আচমকা গুলি এসে লাগে মোকলেছের ডান হাতের তালুতে। রক্ত ঝরছে অবিরাম। কিন্তু সে থেমে নেই। সে শত্রুর রক্ত ঝরাতে ব্যস্ত। এবার গুলি লাগে তার বাম হাতের তালুতে। তাতেও মোকলেছের ভ্রূক্ষেপ নেই। এক জীবনে এমনি একটি যুদ্ধই তো যথেষ্ট। যতটুকু সময় কোম্পানি দু'টি নিরাপদ পশ্চাদপসরণের জন্য প্রয়োজন ছিল ততক্ষণ সময় এর মধ্যেই এই তিন যোদ্ধা অর্জন করেছে। সবাই নিরাপদে চলে গেছে। তাদের প্রাণ নিরাপদ করতে এরা লড়ছে। হাই তার কাজ করে গেছে। অসম্ভব হয়ে আসছে আর লড়াই করা। চারদিকে বৃষ্টির মতো গুলি। দুই পাকসেনা পেছন থেকে এসে এখলাসকে আত্মসমর্পণ করতে হুকুম দিল। এখলাসের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এসএলআর-এর ব্যারেল বাম দিকে ক'রে মাথার ওপর তুলে ধরল। তাকে নিয়ে যাচ্ছে থানার দিকে। এক পাকসেনা এসে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিল তার বাম কানে। বাম কান দিয়ে এখলাসের রক্ত পড়া শুরু হলো। এখলাস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সামনে একটা অপমানকর এবং কষ্টকর মৃত্যু। এমন সময় আরেক পাকসেনা এসে তার রাইফেলের বাট দিয়ে তার ডান বুকের ওপর আঘাত করল সমস্ত শক্তি দিয়ে। এখলাস সইতে না পেরেও সইল। তাকে বাঁচতে হবে। এখনো তার হাতিয়ার তার হাতে। চেম্বারে গুলি, ম্যাগজিনেও গুলি। এখনো সে পরাজিত নয়। যে যুদ্ধ সে শুরু করেছে সে যুদ্ধ তাকেই শেষ করতে হবে—এখলাস জানে। মুহূর্তে চিন্তা না ক'রেই মাথার উপর আড়াআড়ি ক'রে রাখা এসএলআর-এর ব্যারেল ঘুরিয়ে এখালাস প্রহরারত সৈনিকের মাথায় গুলি করে নিজে পেছনে প'ড়ে গেল যেন প্রহরীর গুলি তার না লাগে। তার মাথার পিছন দিকটা পড়ল রাস্তার ইটের উপর। মাথা ঝিম ঝিম করছে। চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কষ্ট করে উঠে বসল এখলাস। পাকসেনারা হতবিহ্বল। এখলাসের সময় নেই। সামনে শত্রুর যে সৈনিকরা ছিল, তাদের গুলি করে পালিয়ে আসে। গোটা এলাকা ঘিরে শত্রুরা তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। এখলাস জিতে গেছে। জিতে গেছে বুদ্ধিতে, সাহসে ও শক্তিতে।

বাম কানটা আজো অকেজো এখলাসের। মোকলেছও আহত অবস্থায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। কিন্তু বেঁচে আর যাবে কোথায়? এ প্রাণ এ দেশের জন্য উৎসর্গিত হতেই হবে—অমোঘ নিয়তি। নভেম্বরের প্রথম দিকে কেন্দুয়া-মদন রাস্তায় বাউসের বাজারের যুদ্ধে এ মৃত্যুহীন যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করে।

AMARBOI.COM

অন্যরকম সৈনিক

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Individuals who need the least introduction get the most—কিন্তু এই লেখায় আমাদের আজকের আলোচিতব্য ব্যক্তিদের নিয়ে সাতকাহন লেখা হলেও নিশ্চিত তারা অপরিচিতই রয়ে যাবেন। তবুও এ লেখা তাদেরই নিয়ে—মুক্তিযুদ্ধের সেই সব দিনে যারা চিরকালীন স্মারক হয়ে রইলেন এই জনপদে, পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে।

দেশময় পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর মুক্তিবাহিনীর অপ্রচলিত যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচিত রণকৌশলগত স্থানে খণ্ডযুদ্ধ পরিচালনা শুরুর ফলে পাকিস্তানিরা তাদের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হলো। গোটা দেশের সব অঞ্চলেই তারা শক্তিশালী হতে চাইল। লোকবল এবং সরঞ্জামের বিচারে এটা ছিল পাকিস্তানিদের আকাশকুসুম পরিকল্পনা। এ বিষয়ে পাকিস্তানি সমরবিদরাও যে একেবারে অসচেতন ছিলেন—তাও নয়। রাজাকার এবং ইপিসিএএফ দিয়ে তারা নিজেদের লোকবলের অভাব পূরণ করার চেষ্টা করল। ছোট ছোট ক্যাম্পের আশপাশে, ৫/৬ জন করে, রাতে পেট্রোলিং করত—প্রধানত, নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষদের ঘোর না কাটলেও সাফল্য অবশ্য এতে কম আসেনি। বাঙালি সেবাদাসদের সংখ্যা অভাবনীয়ভাবে বেড়ে গেল। আমাদের শত্রু-মিত্র চেনাও সহজ হলো।

চান্দিনা থানার সামনের রাস্তাটা পশ্চিম দিকে শ'দেড়েক গজ গিয়ে মোড় নিয়ে পঁচিশ গজের মতো গিয়েছে উত্তর দিকে। তারপরেই পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে মাধাইয়া, ইলিয়টগঞ্জ হয়ে দাউদকান্দি। দ্বিতীয় মোড়ের লাগোয়া পূর্ব দিকে একজোড়া বাঁধানো কবর। এখান থেকে পশ্চিম দিকের কয়েকশ' গজ পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে বাজার, বাসস্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জসহ থানা সদরের যাবতীয় স্থাপনা। কবরগুলোর কাছেই বিশাল কয়েকটি টিনের পাটগুদাম। আমরা খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হলাম, চান্দিনা থানা থেকে পশ্চিমে বাজার পেরিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অবধি পাকিস্তানি ছোট দল রাতে পেট্রোলিং করে। এদের অস্ত্র সাধারণত হাতে কিংবা স্লিং এর সাহায্যে কাঁধে ঝোলানো থাকে। মুক্তিবাহিনীর সাথে এ যাবৎ এদের কোনো মোকাবেলা হয়নি। এ পেট্রোলিং তাই গা-ছাড়া ধরনের নৈমিত্তিক কাজে রূপ নিয়েছে। এম্বুশের জন্য রণকৌশলগত বিবেচনায় সব দিক দিয়ে আদর্শ টার্গেট। আমরা এ পেট্রোল এম্বুশের পরিকল্পনা করলাম।

AMARBOI.COM

একহারা গড়নের লোক আব্বাস। উপরের পাটির মাঝখানের কয়েকটি দাঁত সবসময় উলঙ্গ থাকে। বর্ণ পরিচয়হীন এ লোকটি শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। যে মুক্তিযোদ্ধা নয়, প্রথাগত যুদ্ধের কোনো প্রশিক্ষণও তার নেই। যুদ্ধের শুরু থেকেই সে আমাদের সাথে আছে। গায়ে শক্তি নেই; কিন্তু মনের শক্তি অফুরন্ত। যুদ্ধসংক্রান্ত যে কোনো কাজের জন্য সে একপায়ে খাড়া। বুঝশক্তি কম, বোধশক্তিও ভোঁতা। আব্বাসের সাথে আমাদের কোনো পূর্বপরিচয় নেই। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট কোষা নৌকা ছিল। নৌপথে রেকি বা যাতায়াতের জন্য আমরা এটাকে ব্যবহার করি। আব্বাস এই নৌকার মাঝি। আমাদের সঙ্গে থেকে থেকে আব্বাস আমাদেরই একজন হয়ে গেছে। আমাদের সব কাজেই তার সীমাহীন উৎসাহ। যেহেতু আমাদের কোনো বেতার যোগাযোগ ছিল না, তাই খবর আদান-প্রদান করতে হতো লোক মারফত। আব্বাস সেজন্যও অত্যন্ত কার্যকরী বার্তাবাহক। শুধু বিশ্বাসযোগ্যতার কারণেই নয়, তার চলাচলের দ্রুততার জন্যও। ও হাঁটতে পারত না, দৌড়াবার মতো ছিল তার ছন্দোবদ্ধ চলন। ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই—শ্রান্তিহীন এক কর্মী। লগি, বৈঠা, হাতিয়ার—তার দুটো হাত সবকিছুর জন্যই সই।

একাত্তরের সেপ্টেম্বর। রাত সাড়ে বারোটার দিকে আমরা পাঁচজন পৌঁছালাম বাজারের উত্তর দিক থেকে এসে। কবরগুলোর কাছে রাস্তার লাগোয়া উত্তর পাশে শূন্য পাটের গুদামে রাস্তার দিকে মুখ করে অবস্থান নিলাম। ঘরের কিছু অংশ খুঁড়ে ফায়ার করার সুযোগ করতে হলো। আব্বাসও আছে আমাদের সাথে। সবার কাছে এসএমসিসহ ২৮ রাউন্ড করে দুই ম্যাগজিন ভর্তি গুলি। কঠোর নির্দেশ দেয়া আছে, আমি গুলি করবার আগে কেউ গুলি করবে না এবং আমি বন্ধ করতে বলামাত্রই সবাই গুলি বন্ধ করবে। আমাদের পশ্চাদপসরণের পথ এবং মিলনস্থান পূর্ব-নির্ধারিত ছিল। তবুও আমরা একেবার নির্ভয়ে ছিলাম না। দালালদের গায়ে সাইনবোর্ড থাকে না। তাছাড়া ভেতরে পশু হলেও গড়ন, গঠন তো মানুষেরই মতো। রাত দু'টোর কিছু বেশি বাজে। চাঁদনি রাত। নিশ্চুপ অপেক্ষা করছি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পাঁচজন পাকিস্তানি সৈনিক কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে গল্প করতে করতে থানার দিক থেকে বাজারের দিকে আসছে। আব্বাস আমার পাশে। রাতের নিস্তব্ধতায় ওদের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। ওরা তখনো প্রায় পনেরো গজ দূরে। আমাদের সামনে এলে দূরত্ব হবে পাঁচ গজের কাছাকাছি। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি একজন বলছে,"শ্যালা, মুক্তিলোগ কিধার হ্যায়? উনকো পাত্তা নেহি মিলতা হ্যায়?" আব্বাস উর্দু জানে না, অর্থ বোঝারও কথা নয়। শিশু হোক আর পশু হোক—আদর, স্নেহ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, ভালোবাসা সবাই এসবের মর্ম বোঝে। হয়তো তেমনই কিছু একটা বুঝল আব্বাস। আমার কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করেই বলে উঠল, "স্যার, আমি পাতা মিলাইয়া দেই?"—বলেই ফায়ার। এক লম্বা বার্স্টে বোধহয় এক ম্যাগজিন গুলি ওর শেষ হয়ে গেল। ক্ষণভঙ্গুর সেই মুহূর্তে আমাদের

AMARBOI.COM

সময় নষ্ট করার সময় ছিল না। উপর্যুপরি কয়েক বার্স্ট ফায়ার ক'রে শুধু ওদের, আমার মাতৃভূমির উপরে চেপে বসা মানুষের স্বরূপে কিছু অমানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করলাম।

তরল চরিত্রের কিছু লোক থাকে। এরা সহজেই সব পাত্রে নিজেদের স্থান সংকুলান ক'রে নিতে পারে। এদের মেরুদণ্ড থাকে না বলে এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জানে না। প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতেও শেখে না। স্বার্থের প্রশ্নে এরা হাঁটুর ওপর ভর করে আজীবন বাঁচতে চাইবে, কিন্তু দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে মরতে চাইবে না। সব রকম লোকের সাথে ভালো থাকার বিচিত্র গুণ আছে এদের। পকেটে হাত রেখে সাফল্যের মই এরা তর তর করে বাইতে পারে। একাত্তরে পাকিস্তানিদের চাকরি না করলে এবং মুক্তিযুদ্ধে এদের মেধার সাহায্য না দিলে কিছু ছেলেপেলে আর বাঙালি পুলিশ-আর্মির লোকেরা শুধু ফুটফাটই করত, দেশ কখনও স্বাধীন হতো না—অকাট্য যুক্তি দিয়ে এরা তা প্রমাণও করতে চাইবে। অন্য ভাষায় এদের আমলা ও বুদ্ধিজীবী বলা হয়।

কুমিল্লার মুরাদনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তেমনই একজন ব্যক্তি। পাকিস্তানিদের সঙ্গে ওঠাবসা এবং ভালো আলাপ পরিচয় তার। আমাদের সাথে কথা বলার প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বললেও পরে প্রাণের ভয়ে নিজ উদ্যোগে আমাদের সঙ্গে খোলা মনে আলাপ করলেন। মুরাদনগর-কোম্পানীগঞ্জ এলাকায় পাকিস্তানিদের অবস্থান ও সংখ্যা ভদ্রলোক সঠিক ও নির্ভুলভাবে আমাদের দিতে লাগলেন। তার দেয়া খবরাখবরের ভিত্তিতে অপারেশন পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহের জন্য আব্বাস ও আমি নৌকা নিয়ে মুরাদনগর থানা এলাকায় শত্রু অবস্থান রেকি করতে রওনা হলাম। নৌকা দূরে কোথাও রেখে বেশ কিছু হাঁটাহাঁটি আছে। চার/পাঁচ ফুট পানির ওপর মসৃণ সবুজ আঁচলের মতো ধানক্ষেত। নৌকার পাটাতনের নিচে বাঁশের মাচার ওপর আমাদের হাতিয়ার। আমরা মুরাদনগর থানার উত্তরে করিমপুর গ্রামের কাছে আসতেই রাস্তার ওপর জড়ো হওয়া কিছু লোক আমাদের নৌকা পাড়ে ভেড়াতে বলল। আব্বাস সাথে সাথেই নৌকা থামিয়ে দিল। পরক্ষণেই দেখলাম কিছু লোক বর্শা, কোচ, রামদা নিয়ে আমাদের নৌকা ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে। আব্বাস বলল, "স্যার, শালাগো সব লাশ ফালাইয়া দেই?" আমি ধমক দিয়ে বললাম, "তুমি নৌকা ঘোরাও।" আব্বাস তবুও এসএমসি বের করে পাটাতনের ওপর রাখল। নৌকা ঘুরিয়ে বৈঠা বাইছে সে সর্বশক্তিতে। হঠাৎ দেখি এক লোক বুক পানিতে নেমে আমাদের নৌকার সামনে দু'হাত তুলে নৌকা থামতে বলছে। এ লোকটি যে কোন দিক দিয়ে এসেছে, আমরা লক্ষই করিনি। আমার লক্ষ ছিল 'শহীদী' দরজা পাবার জন্য যারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। আমি লোকটিকে সরে দাঁড়াতে বললাম। বললাম যে, এক্ষুণি সরে না দাঁড়ালে গুলি করব। কিছুই হলো না। লোকটি দুহাত দিয়ে নৌকা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ধাবমান 'জেহাদীরা' পানি ভেঙে আমাদের দিকে

AMARBOI.COM

ছুটে আসছে। আর সময় দেয়া গেল না। লোকটির উরুতে গুলি করলাম। সে পানিতে পড়ে গেল। আব্বাস প্রাণপণে লগি বাইছে। আমার হাত 'কক' করা এসএমসি'র ট্রিগারের উপর, দৃষ্টি প্রসারিত। দূরে কয়েকটা গুলির শব্দ শুনলাম। রাজাকারদের গুলি লক্ষবস্তুতে লাগে না। আমাদের গায়েও লাগল না। আমরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেলাম। আব্বাস কাঁচা রাস্তার ওপর সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। তখন তার মুখের দু'কোণায় ফেনা। আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে। আব্বাসকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরব, মনেই রইল না।

দুই.

যত সাধারণই হোক না কেন, বলবার মতো প্রত্যেকেরই একান্ত কিছু গল্প থাকে। মোকছেদেরও আছে। পেশিবহুল সুঠামদেহী পুরুষ মোকছেদ। সুন্দর একটি কোষা নৌকা তার। নৌকাটি নিয়ে সে আমাদের সাথে থাকে। কবে, কোথায় সে আমাদের সাথে তার নৌকাটি নিয়ে এসেছিল মনে পড়ে না। প্রয়োজনও ছিল না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও বিয়ে করেনি মোকছেদ। গাঁ-গেরামে এ বয়সে এক ঘর পোলাপানের বাপ হওয়া যায়। তিতাস নদীতে মোকছেদের নৌকায় বসে জিজ্ঞেস করলাম, "মোকছেদ বিয়া করো না ক্যান?" মোকছেদ হাসতে হাসতে বলল, "বিয়া আর করতাম না।" বললাম, "ক্যান?" হঠাৎ হাসি মিলিয়ে গেল মোকছেদের। নৌকায় বসে মাঝির চোখে চোখ রেখে কেউ হয়তো গল্প করে না। তবুও কেন জানি ঘুরে তাকালাম মোকছেদের দিকে। দূরে ঈশান কোণে মেঘটা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। ভর দুপুরে অন্ধকার হয়ে এলো বেলা। পুরদিকে ঘোড়াশাল গ্রাম পার হয়ে কোষা নৌকা চলছে। আমাদের মোকছেদ নৌকা বাইছে কি বাইছে না, তার নিজেরও খেয়াল নেই। ক'সেকেন্ডে বহু বছরের অতীত পথ ঘুরে ফেলল মোকছেদ। বলল, "স্যার, হেইডা একটা সাগর।" জীবনে কিছু কিছু কথা থাকে, যা সবাইকে বলা যায়। কিছু কিছু কথা থাকে যা কিছু কিছু লোককে বলা যায়। কিছু কিছু কথা থাকে যা কেবলমাত্র আপন মুষ্টিমেয় স্বজনকে বলা যায়। কিছু কথা থাকে শুধুমাত্র একান্ত এক-দুইজনকে বলা যায়। তারপরও কিছু কথা থাকে জীবনে, যা কাউকেই বলা যায় না। মোকছেদের সেই সাগর কাউকেই বলবার নয়। বেদনাবিধুর এক মধুর অতীত। একান্তই আপনার। বললাম, "মোকছেদ, কালাডুমুর পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?" মোকছেদ আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ভালোই বুঝল। নিরুত্তর নৌকা বেয়ে চলল মোকছেদ। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি আমারো প্রয়োজন ছিল না। আমিও যেন কী ভাবছিলাম। এর মধ্যে ঘণ্টাখানেক সময় হয়ত পার হয়ে থাকবে। মোকছেদ মুখ খুলল আবার, "স্যার, আমরাও মানুষটি সাড়ে তিন আত, পাঞ্জ্যাব্যারাও মানুষডি সাড়ে তিন আত, খাইছে কেবল তারার ওই দেড় আইত্যাডায় (দেড় হাতি অস্ত্রটায়)। আমরারেও দ্যান স্যার অস্ত্র। দেশ আবার সাদিন অয় না ক্যামনে দেহি।" মোকছেদকে অস্ত্র দেয়া হয়নি। ওকে অস্ত্র দেয়া

AMARBOI.COM

যায় না। কেন দেয়া যায় না ওকে সেটি বোঝাবার চেষ্টা করলাম না। অস্ত্র ছাড়াই এক আশ্চর্য যুদ্ধ করেছে মোকছেদ।

কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের ওপর ইলিয়টগঞ্জ এবং মাধাইয়া বাজারের মাঝামাঝি স্থানে যে সেতুটি, সে এলাকার নাম খাদঘর। মোকছেদ একদিন বলল, "স্যার, কয়ডা পাঞ্জাবি আর পাঁচ/ছয়ডা রাজাকার পোলডা পাহারা দেয়। ইডিরে ধইরা লইয়া আই?" "কেমনে?" আমি জানতে চাইলাম। মোকছেদ মনে মনে এ পরিকল্পনা যে বহুদিন যাবৎ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। দেখলাম তার পরিকল্পনার কমা-সেমিকোলনগুলোও সে যথাস্থানে বসিয়েছে। দু'জন ছেলে এসএমসি নিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বেবিট্যাক্সিতে মাধাইয়া বাজারের পশ্চিম দিক থেকে ইলিয়টগঞ্জের দিকে রওনা হবে। বেবিট্যাক্সি খাদঘর সেতুর কাছে এলে পাঞ্জাবীরা বা রাজাকাররা আরোহীদের তল্লাশি করতে থামাবে। আর যদি না থামায় তবে তারা নিজেরাই সেতুর পুবদিকে শত্রুর ব্যাংকারের কাছে থামবে। ফলে নিশ্চিত যে শত্রুর কেউ না কেউ বেবিট্যাক্সি থামার কারণ জিজ্ঞাসা করতে আসবে। এমন অবস্থায় অস্ত্র হয় থাকবে শত্রুর কাঁধে, অথবা ঝুলন্ত অবস্থায় তাদের হাতে। যেহেতু বেবিট্যাক্সিতে আমাদের ছেলেরা গুলি করার জন্য প্রস্তুত থাকবে—সেহেতু মুহূর্তেই তাদের ওপর গুলি করা যাবে এবং পরক্ষণেই বাকিদের হত্যা করা যাবে—কেননা কয়েক সেকেন্ডে তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে পারবে না। আমাদের কিছু ছেলে আগে থেকেই অবস্থান নিয়ে থাকবে লাগোয়া উত্তর দিকের গ্রামে। অতএব ওদের হত্যা করা এবং শত্রুর সব অস্ত্র দখল করা যাবে। মোটামুটি এই ছিল সংক্ষেপে মোকছেদের পরিকল্পনা। অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সাহসী পরিকল্পনা, সন্দেহ নেই। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অপূর্ব এ রেইডের পরিকল্পনা মোকছেদের মাথায় এলো কী করে? মোকছেদকে তার এই পরিকল্পনার ওপর কোনো মন্তব্যই করলাম না। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করব বলে মনস্থির করলাম। রণকৌশলগত কারণে এ পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হলো। তবে মোকছেদই রইল এ পরিকল্পনার মূল প্রণেতা। বেবিট্যাক্সির দু'জন ছেলেকে এসএমসি 'লোড' এবং 'কক' করতে বলা হলো 'সেফটি ক্যাচ' 'অফ' অবস্থায়। দু'জনের প্রত্যেকের কাছে দেয়া হলো 'প্রাইম' করা দুটি এইচ ই-৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড। কোমরে দেয়া হলো আরো দুটি 'প্রাইম' করা গ্রেনেড। ব্যাংকারের ভেতর অবস্থানরত শত্রুদের উদ্দেশ্যে 'লব' করার জন্য দেয়া হয়েছিল গ্রেনেডগুলি। কিছুই না ব'লে দৃশ্যত অকারণেই অপারেশনের সময় গুলির বাক্স কাঁধে দিয়ে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম মোকছেদকে। মোকছেদ ব'সে ব'সে দেখল নিমিষ দু'য়েকের মধ্যে কীভাবে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো।

তিন.

আমরা ৯৪ জন ছেলে সাথে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অস্ত্র এবং প্রতি অস্ত্রের সাথে প্রথম সারির গুলি। তাছাড়া রয়েছে ৪০০ পাউন্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, ৭০০ পাউন্ড জেলেটিন এক্সপ্লোসিভ, ৩৪টি এনারগা-৯৪ গ্রেনেড, বিভিন্ন ধরনের ডেটোনেটার,

AMARBOI.COM

প্রাইমার কর্ড, সেফটি ফিউজ, ৪৫টি মার্ক-২এন্টি ট্যাংক মাইন, ৬০টি এম-১৪ এন্টি পারসোনাল মাইন, ৮৫টি পি-৮০ স্মোক গ্রেনেড, ১৫০টি পি-২ নন-ডিটেকটিভ এন্টি পারসোনাল মাইন, বেশ কিছু এইচ ই-৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড, সংরক্ষিত গোলাবারুদ ইত্যাদি। ত্রিপুরার মেলাঘরে ২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর থেকে আমরা কুমিল্লার মুরাদনগর থানায় আসব। মেলাঘর থেকে গাড়িতে যাব মন্তলা। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দীন মন্তলা থেকে নৌকা এবং গাইডের ব্যবস্থা করবেন। মন্তলা থেকে আখাউড়ার মনিয়ন গ্রাম হয়ে নৌকায় আখাউড়া রেলস্টেশনের দক্ষিণ দিকের কালভার্টের নিচ দিয়ে (যে কালভার্টের দু'দিকে পাকিস্তানি সৈন্যদের সুরক্ষিত অবস্থান) পার হয়ে আমরা উজানীশ্বর বিলে পড়ব। বিল পাড়ি দিয়ে আমরা পার হবো কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক, তন্তর পুলের নিচ দিয়ে। এ পুলের ওপর প্রধানত যে রাজাকাররা পাহারা দেয়, তারা আদতে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত ছেলে। পূর্ব থেকে তাদের সাথে আমাদের আগমনের বিষয়ে সমন্বয় করা ছিল। মাঝে মাঝে এ পুলের ওপর রাজাকারদের সাথে পাকিস্তানি সৈন্যরাও থাকে, তবে তাদের অবস্থান স্থায়ী নয়। আমাদের বলা ছিল, আমরা বিলের ওপর থাকতেই কিছুক্ষণ পর পর পুবদিকে লক্ষ করে রাজাকাররা টর্চের আলো জ্বালাবে। টর্চের কাচের ওপর লাগানো থাকবে লাল, সবুজ বা নীল রঙের কাগজ। লাল আলোর সংকেত দেখলে বুঝতে হবে যে, পুলের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যদের পাহারা আছে। সবুজ বা নীল সংকেত দেখলে বুঝতে হবে যে, পুলের ওপর পাকিস্তানি সৈন্য নেই, নিরাপদে পার হওয়া যাবে। ২৮/২৯ সেপ্টেম্বর। রাত প্রায় তিনটা বাজে। আমরা সবাই ১১টি নৌকায় উজানীশ্বর পুলের কাছে আসতেই টর্চে লাল আলোর সংকেত দেখতে পেলাম কয়েকবার। ততক্ষণে আমাদের ফিরে যাবার সময় পার হয়ে গেছে। কারণ বিল পাড়ি দিতেই ভোর হয়ে যাবে। উপায়ন্তর না দেখে আমরা কোম্পানীগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের পার্শ্বে শাহপুর গ্রামে বাকি রাত ও পরবর্তী দিনের জন্য আশ্রয় নিলাম। উদ্দেশ্য, পরের রাতে আমরা রাস্তা পার হয়ে গন্তব্যস্থানে যাত্রা করব। বাকি রাত এবং পরের দিনটি কাটিয়ে আমরা সন্ধ্যায় সমবেত হয়েছি যাত্রা করব বলে। এমন সময় হঠাৎ করে আমাদের ওপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু হলো। নিঃসন্দেহে বুঝলাম পাকিস্তানিদের এ আক্রমণ দিনে হয়ে রাত্রে হবার কারণ। পাকিস্তাদের ক্যাম্পে গিয়ে খবর দিতে ও খবরের সত্যতা তাদের বিশ্বাস করাতে এবং পাকিস্তানিদের আমাদের অবস্থান পর্যন্ত আসতে তারা সময় হারিয়ে ফেলেছে। পাকিস্তানিরা আমাদের সঠিক অবস্থান জানত না (জানার কথাও নয়)। কেননা সন্ধ্যার এই সমবেত হওয়ার স্থান আমরা নির্বাচন করা হয় বিকেলে। যা হোক, রাতের এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য আমরা সার্বিকভাবেই অপ্রস্তুত ছিলাম। সত্যিকার অর্থে হতবিহ্বল হয়ে গেলাম আমরা। আমাদের অবস্থান পাকা রাস্তা থেকে মাত্র ৬/৭ শ' গজ দূরে। শত্রু বেশ দূর থেকে রাতের অন্ধকারে লক্ষ্যহীনভাবে আমাদের ওপর ফায়ার করছিল। আমাদের সে ফায়ারের

AMARBOI.COM

জবাব দেবার প্রয়োজন না থাকলেও অনির্দিষ্ট সময় কোনোভাবেই সেখানে থাকা সমীচীন ছিল না। আমরা কোনোভাবেই পালাবার এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছবার কোনো পথ ভাবতে পারছিলাম না। আমি আদেশ দিলাম সবাইকে তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র একসাথে স্তূপ করতে। বললাম প্রয়োজন হলে আমরা যুদ্ধ করে শত্রুর ভেতর দিয়ে পথ করে নেব; তাতে যতজন বাঁচি আর যতজন মরি। এমন সময় কোত্থেকে গ্রামের এক লোক এসে আমাদের খবর দিল যে, রাস্তার পাশে শত্রুর সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গোলাগুলির সময় নিরস্ত্র লোকজন খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। লোকটিকে নিয়ে আমরা ক'জন ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাঁচা সড়ক ধ'রে পাকা রাস্তার কাছে গিয়ে দেখলাম লোকটির দেয়া খবর সত্যি। পেছনে ফিরে এলাম। সিদ্ধান্ত নেবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কোনোভাবেই কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেননা রাস্তা পার হয়ে আবারো বিল। সেখানেও নৌকা লাগবে। নৌকার কোনো জোগাড় নেই। যে লোকটি আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে, তার গায়ে সাদা একটি ফুল শার্ট, পরনে লুঙ্গি। লম্বা পাতলা গড়নের এ লোকটির সাথে আমাদের কারো কোনো পূর্ব পরিচয় নেই। কথাবার্তায় মনে হলো কিছু লেখাপড়া আছে। অত্যন্ত সাধারণ এ মানুষটি মোটেও সাধারণ নয়। তার নাম আমজাদ। আমজাদ বলল, "স্যার, চারিদিক দিয়া পাঞ্জাবিরা ঘিরা ফেলছে। সবচে নিরাপদ হইব স্যার শত্রুর গাড়ির ফাঁক দিয়া রাস্তা পার হওয়া। এইখানে শত্রু মোটেই সন্দেহ করত না। শত্রুর পাহারাও কম থাকব।" আমি শিহরিত হয়ে উঠলাম, এটাই পথ। বললাম, "ওপারে নৌকা?" আমজাদ বলল, "হেইডা স্যার ভাইবেন না। বাইত বাইত নৌকা থাকলেও কেউই স্যার নৌকা দিতে রাজি হইব না। আমি দেখাইয়া দিমু স্যার কার কার বাইত নৌকা আছে। আফনেরা ধমক দিলেই নৌকা বাইর কইরা দিব।" শত্রুর গাড়ির কনভয় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে স্থান অরক্ষিত থাকার কথা নয়। নিঃশব্দে পার হতে চাইলেও কোনোভাবে শত্রু টের পেয়ে গেলেই গুলি হবে। আমজাদকে যত সহজে বিশ্বাস করা উচিত ছিল তার চেয়েও সহজে বিশ্বাস করলাম। কেননা, সে সবসময়ই আমাদের সাথে থাকবে। শত্রুর চর হিসেবে আমাদেরকে শত্রুর পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে গেলেও সে তো আর পালাতে পারছে না। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমরা আমজাদের পরিকল্পনা মতো রাস্তা পার হলাম নিরাপদে। নৌকার হদিসও দিল আমজাদ। আমরা কেউই রণবিশারদ নই। তবু রণকৌশলের মূল বিষয়গুলো আমাদের একেবারে অজানা নয়। আমরা এতগুলি মাথা যা ক্রান্তিকালে ভাবতে পারিনি, আমজাদ সহজেই তা আমাদের ব'লে দিল। আমরা যখন সবাই নৌকায় উঠে নৌকা ছেড়েছি তখন দ্বিতীয় পক্ষের বাঁকা চাঁদ আকাশে উঠছে। আমজাদের বিচক্ষণতা ও মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস আমাদের রক্তক্ষরণ বাঁচিয়ে দিল।

নৌকা চলছে সন্তর্পণে। আমজাদকে হাত নাড়িয়ে বিদায় দিতে দিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সাদা শার্ট রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

AMARBOI.COM

চার.

১৯৮৯ সালে ফরিদপুরে এক ধর্মীয় জলসায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের সাথে বৃহত্তর কুমিল্লা থেকে এসেছে লঞ্চ কাফেলা। শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধ লোক হঠাৎ করে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "স্যার, ক্যামন আছেন? এতদিনে স্যার আফনের দ্যাহা পাইলাম।" লোকটির মুখে উল্লাস আর উচ্ছাসের ভাব। আমি একটু হকচকিয়ে বললাম, "ভাই আমি আপনাকে ঠিক স্মরণ করতে পারছি না।"

"স্যার, আমি মোকছেদ।"

আমি স্থির হয়ে গেলাম। তাকিয়ে রইলাম মোকছেদের দিকে। আবেগে উদ্বেলিত মোকছেদ যুদ্ধের সময় আমার সাথে ছিল। একসাথে আমরা কী কী করেছি তার স্মৃতিচারণ করছে তার সঙ্গীদের কাছে। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে পারছে না মোকছেদ। দ্রুত ব'লে চলেছে সে। সময় পরিবর্তন করে না পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই। সময় সুঠামদেহী মোকছেদকে ন্যুব্জ করে ফেলেছে। বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে। আমি শুধু তাকিয়ে দেখছি। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল না, মোকছেদ বিয়ে করেছে কি-না। মোকছেদ অনর্গল কথা বলে চলেছে। সবাইকে বলছে, "আল্লায়েনা স্যারেরে আমাগো লগে দ্যাহা করাইয়া দিছে। স্যারের লগে দ্যাহা করতে গেলে কত্‌লা টেহা লাগলো অইলে।" মোকছেদের সাথে অনেক কথা ছিল আমার। অনেক কথা। মোকছেদ বলতে সুযোগ দিল না। যে সত্যটা মোকছেদ জানে না এবং আমি ভুলে গেছি তা হলো, মুক্তিযুদ্ধে মোকছেদ আর আমি ছিলাম একই কাতারের সৈনিক। মোকছেদের সরল ভাষ্য আমাকে এক কঠিন অপরাধবোধে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি ডান হাতটা কপাল পর্যন্ত তুলে সালাম জানিয়ে অকুস্থল থেকে বিদায় নিলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করার আর আমার অধিকার ছিল না। মোকছেদ অবচেতনেই প্রকাশ করেছে যে, আজ তার আর আমার মধ্যে তফাৎ অনেক। আজ তার অর্থের বড় অভাব। যানবাহনের ভাড়া দিয়ে, আইন কানুন, বিধিনিষেধ মেনে আমার সাথে দেখা করতে আসতে পারা আজ ওর সাধ্যের বাইরে। আমি যে সামান্য বড় হয়ে বিস্তর ছোট হয়ে গেছি মোকছেদের উপলব্ধিতেই তা নেই। আমি জানি মোকছেদ আমাকে অপমান করতে পারে না এবং করেওনি। মুক্তিযুদ্ধের যারা বিরোধিতা করেনি—এ গ্লানির অংশীদার আমার সাথে আর সবাইকেও হতে হবে।

পাঁচ.

আমি আসতে আসতে ফিরে তাকাই। মোকছেদ হাতে, চোখে, মুখে কথা বলেই চলেছে।

জনযুদ্ধের গণযোদ্ধারা পিছিয়ে পড়ল এভাবেই।

AMARBOI.COM